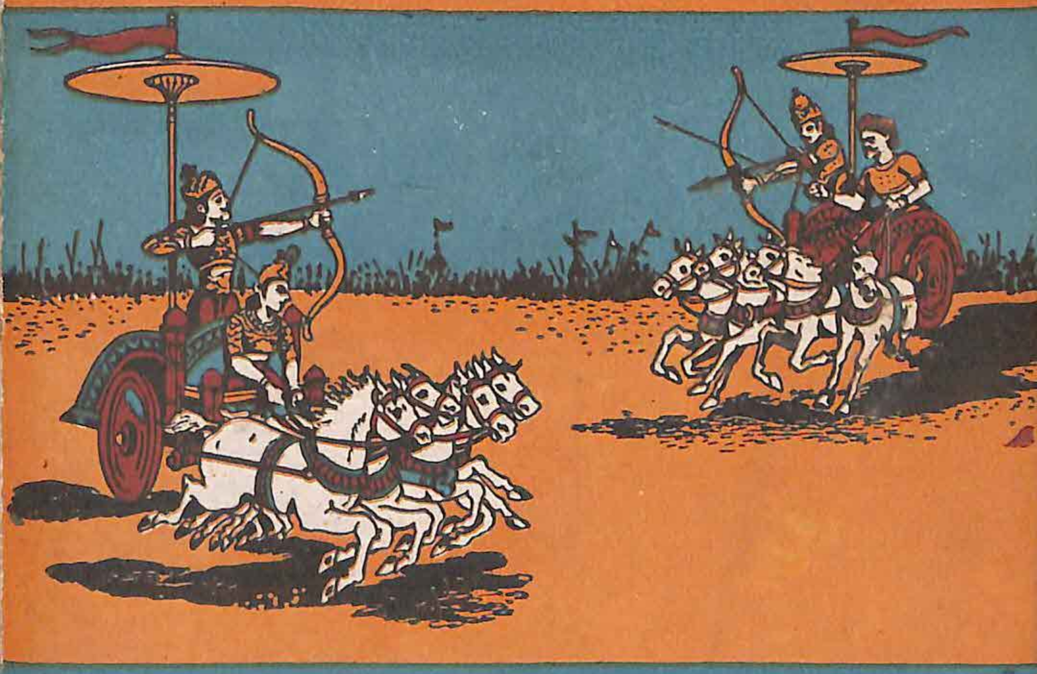
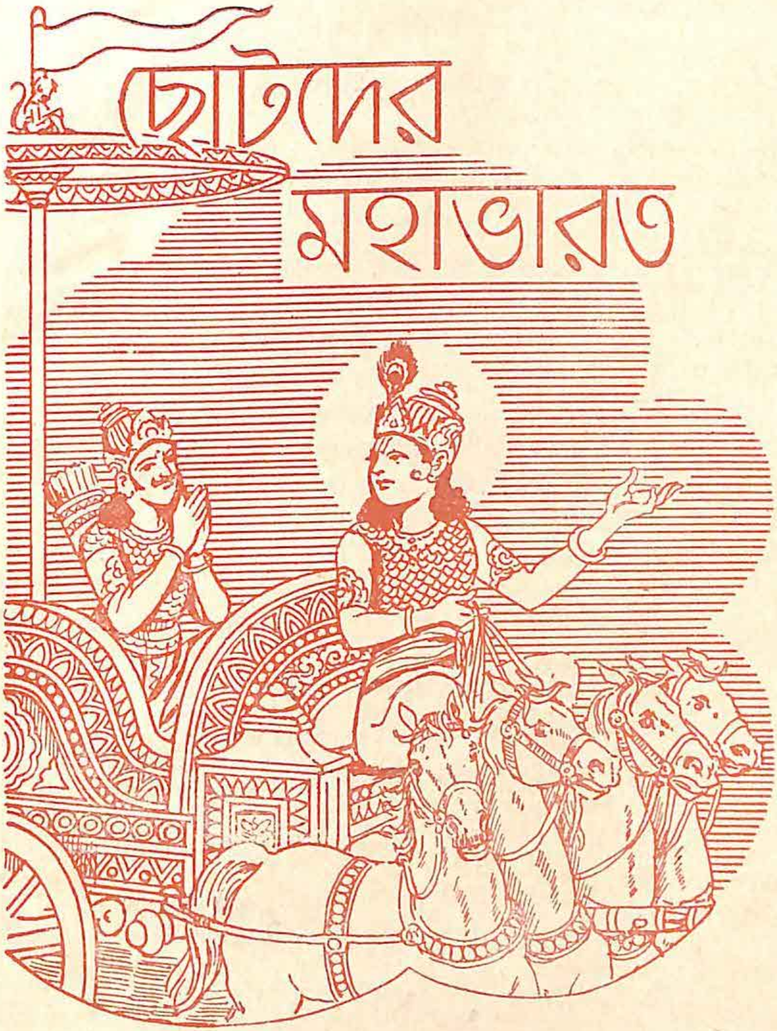
ছোটদের

মহাভারত





শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড

ISBN 0 00121 026 2

রেজিস্টার্ড অফিস

৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

আঞ্চলিক অফিস

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
কামানী মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
জামাল রোড, পাটনা ৮০০ ০০১

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬১

পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭৪ ও ১৯৮৭

দাম ॥ টা. ১০·৫০

প্রকাশক ঃ
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড,
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রাকর ঃ
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

শ্রীযুত পিতাঠাকুর
মহাশয়ের
করকমলে



সূচনা

মহর্ষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। গায়ের রং কাল আর দ্বীপে জন্ম বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হয়। অসাধারণ তপস্যার ফলে তিনি একাধারে জ্ঞানী ও মহাভক্ত হন। বেদকে চার ভাগে ভাগ করায় তাঁহার আর এক নাম হয় বেদব্যাস। এই নামেই তিনি সুপরিচিত। বেদ বিভাগ করা ছাড়াও তিনি আঠারটি পুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং কিছুকাল রাজ্য ভোগের পর শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মহাপ্রস্থান করেন। চার ভাই ও দ্রৌপদী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। পাণ্ডবেরা চলিয়া গেলে পর ব্যাসদেবের ইচ্ছা হয় যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী লইয়া একখানি

পুস্তক রচনা করেন। ভরত বংশের কাহিনী বলিয়া পুস্তকখানির 'মহাভারত' নাম রাখা হয়।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর বেদব্যাস কাহিনীর মূল বিষয়গুলি পর পর সাজাইলেন। তখনকার যুগে নিয়ম ছিল যে কোন কিছু লিখিতে হইলে তাহা পদ্যে রচনা করা হইত।

সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার পর ব্যাসের চিন্তা হইল যে এই কাহিনীটি হইবে মস্ত বড়; রচনা ও লেখা একই ব্যক্তির কর্ম নয়। একজন ভাল লেখক যোগাড় করিতে হইবে। কিন্তু কাহাকে পাওয়া যায়? বহু চিন্তা করিয়াও ব্যাস কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—"তুমি এক কাজ কর। মহাদেবের পুত্র গণেশের শরণ লও। তিনি যদি লিখতে রাজী হন তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। না হলে আর তো কাউকে দেখছি না যে এ কাজের ভার নিতে পারে।" শিবদুর্গা থাকেন কৈলাসপুরীতে। সেইখানে গণেশও আছেন। ব্রহ্মার কথায় বেদব্যাস গেলেন গণেশের কাছে। সাদা হাতীর মাথা, নাদুস-নুদুস লাল টুকটুকে ঠাকুরটি বসিয়া আছেন আরামে। এই সময় বেদব্যাস গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গণেশও তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর আসল কথা আরম্ভ হইল। সমস্ত শুনিয়া গণেশ বলিলেন—"এ বেশ ভাল কাজে হাত দিয়েছেন মহর্ষি। আন্দাজ কত শ্লোক থাকবে বইখানিতে বলতে পারেন?"

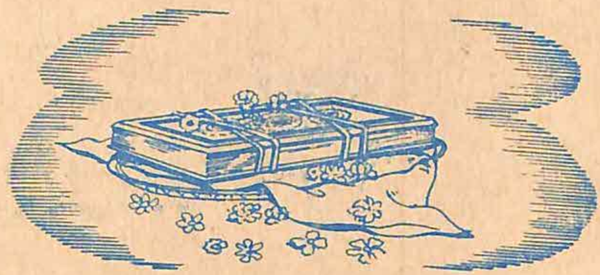
ব্যাস বলিলেন—"তা ঠিক ঠাক বলা বড় কঠিন। তবে

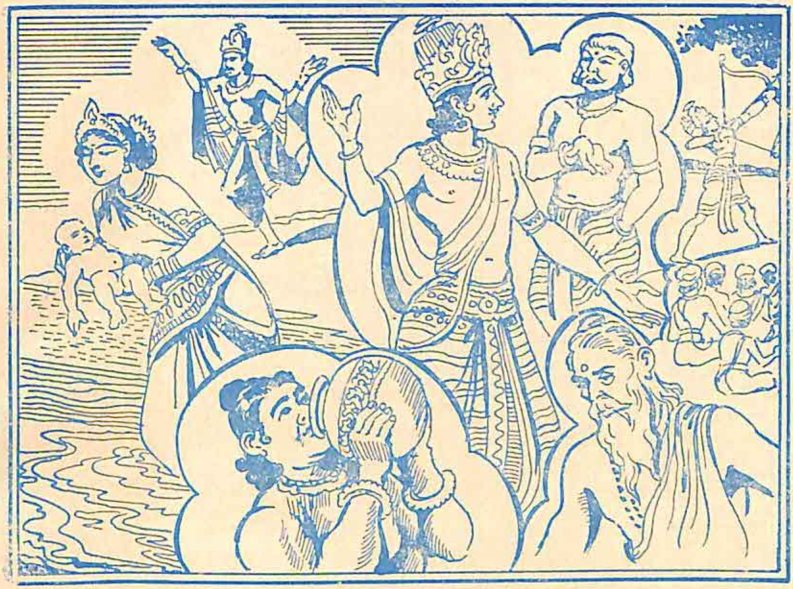
কাহিনী তো বিরাট। আন্দাজ করি, ষাট হাজার শ্লোকের কম হবে না।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া গণেশ বলিলেন—"বেশ, আমিই লিখবার ভার নিলাম, কিন্তু এক শর্তে। আপনি খানিক বলে তারপর ভেবেচিন্তে আবার বলবেন, সে চলবে না। আপনি থামলেই আমি লেখা বন্ধ করে চলে যাব। কেমন, রাজী আছেন এতে ?"

ব্যাস বলিলেন—"খুব রাজী। তবে কিনা আমি যা বলব তা না বুঝে আপনিও লিখতে পারবেন না—এই কথা দিতে হবে।"

গণেশও তাহাতে রাজী হইলেন এবং বেদব্যাসের আশ্রমে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। ব্যাসদেব শ্লোক বলিয়া যান আর গণেশ তখনি তাহা লিখিয়া ফেলেন। মাঝে মাঝে ব্যাসদেব এমন কঠিন শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে গণেশের তাহা বুঝিয়া লিখিতে যেন বেশ কিছুক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সুযোগে মহর্ষি ব্যাসও মনে মনে বহু শ্লোক রচনা করার অবসর পাইতেন। এমনি করিয়া মহাভারত রচনা ও লেখা হইয়াছিল।





আদি পর্ব

তখন দ্বাপর যুগ। চন্দ্রবংশের রাজা শান্তনুর রাজত্ব কাল। হস্তিনাপুরী ছিল তাঁহার রাজধানী। একদিন রাজা গঙ্গার তীরে এক বনে শিকার করিতে গিয়া অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া রাজপুরীতে লইয়া আসিলেন। বিবাহের পূর্বে কন্যার কাছে রাজাকে কথা দিতে হইল যে তিনি কখনও তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিবেন না। বা তাঁহার কোন কাজে বাধা দিতে পারিবেন না। কথা রাখিতে না পারিলে তিনি রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন।

সুন্দরী রানী পাইয়া রাজা খুব খুশী। পর পর তাঁহার সাতটি ছেলে হইল। কিন্তু রানী করিলেন কি, ছেলেগুলি

হওয়া মাত্রই গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। রাগে দুঃখে রাজার মন অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না—পাছে রানী চলিয়া যান।

এই ভাবে কাটিল কিছুদিন। তারপর রানীর আবার একটি ছেলে হইল। সুন্দর ফুট্‌ফুটে ছেলে। ছেলে হইবামাত্রই আগেকার মত রানী তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার জন্য বাহির হইলেন। এইবার রাজার আর সহ্য হইল না। দুই হাত মেলিয়া তিনি রানীর পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন, এই ছেলেকে তিনি কিছুতেই নষ্ট করিতে দিবেন না।

বাধা পাইয়া রানী বলিলেন—"কথা রাখতে পারলেন না—মহারাজ, আমি চললাম।"

রাজা বলিলেন—"তোমার যা খুশী করতে পার রানী। এ ছেলে আমি কিছুতেই নষ্ট করতে দেব না।" একটু হাসিয়া রানী বলিলেন—"আপনার কথাই রাখব মহারাজ। এ ছেলে আপনারই রইল। কিন্তু আমি চলে গেলে একে বাঁচাবেন কি করে ? তাই আমি বলি কি একেও নিয়ে যাই। সময় হলেই আবার আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

রানীর কথায় রাজা চুপ করিয়া রহিলেন দেখিয়া তিনি বলিলেন—"অনর্থক মন খারাপ করবেন না মহারাজ। আমি হচ্ছি গঙ্গাদেবী। অষ্টবসুকে বশিষ্ঠ মুনি শাপ দিয়েছিলেন, যেন তাঁরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁদের কাতর প্রার্থনায় আমাকে আপনার স্ত্রী হয়ে তাঁদের গর্ভে ধারণ করতে হয়েছে। কথা ছিল যে জন্মাবামাত্রই গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে মুক্ত করে দেব। সাতজন মুক্ত হয়ে গেছে। বাকী রইল একজন। কিন্তু এ এখন একেবারে

কচি শিশু তাই সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। এখন আপনি রাজী হলেই নিয়ে যেতে পারি।"

এই কথা শুনিয়া রাজা আর আপত্তি করিলেন না। তখন গঙ্গাদেবী ছেলেটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে বার বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন শান্তনু শিকারে গিয়াছেন। এই সময় গঙ্গা তাঁহাকে ছেলে ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। পরশুরামের কাছে সে সমস্ত শস্ত্র আর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে; আনন্দিত মনে রাজা ছেলেকে লইয়া পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নাম হইল দেবব্রত।

বড় হইয়া দেবব্রত পিতাকে রাজকার্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে প্রজারাও খুব খুশী হইল। দেখিয়া শুনিয়া রাজা শান্তনুর মনে আনন্দ আর ধরে না। ছেলের উপর রাজ্য চালাইবার ভার দিয়া তিনি আমোদ-আহ্লাদ নিয়া থাকেন। একদিন রাজা শিকারে গিয়া আর একটি সুন্দরী কন্যা দেখিতে পাইলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—সে দাস রাজার মেয়ে, নাম সত্যবতী। গঙ্গার অপর পারে জেলেদের পাড়া, সত্যবতীর বাবা তাদের রাজা।

সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনু গেলেন দাস রাজার বাড়ী। রাজাকে দেখিয়া সত্যবতীর বাবা হাত জোড় করিয়া বলিল—"কি আদেশ মহারাজ বলুন।" রাজা বলিলেন—"আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। তোমার কি মত বল।" দাসরাজ বলিল—"এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা। মেয়ে আমার রাজ-রানী হবে এতে অমতের কোন কথাই থাকতে পারে না। তবে কি জানেন মহারাজ—আমার একটি নিবেদন আছে—

আমার কন্যার যেই হইবে কুমার।
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য অধিকার ॥

এতে যদি রাজী হন, নিয়ে যান আমার মেয়েকে। আর না হলে বিয়ে অসম্ভব।” তাহা কি করিয়া হয়, ইহা হইলে দেবব্রতের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। ক্ষুণ্ণমনে শান্তনু ফিরিয়া গেলেন রাজপুরীতে।

এই কথা দেবব্রতের কানে গেল। তিনি তখনি সেই দাসরাজের বাড়ী গিয়া পিতার জন্য তাহার মেয়েকে চাহিলেন। দাসরাজ বলিল—“কিন্তু আমি রাজাকে যা বলেছিলাম তার কি হবে রাজকুমার?” দেবব্রত বলিলেন—“তোমার কথাই থাকবে দাসরাজ। আমি সিংহাসনে বসব না কিছুতেই।” সত্যবতীর পিতা ছিল ভারী চালাক। সে বলিল—“অতি উত্তম কথা, রাজকুমার; কিন্তু আপনার ছেলেরা তো ভবিষ্যতে গোলমাল বাধাতে পারেন, তার কি হবে?” দৃঢ়কণ্ঠে দেবব্রত বলিলেন—“এই ভয় তোমার! আমি প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে কখনও বিবাহ করব না। নাও, এখন হলো তো?” এবার দাসরাজের আর আপত্তির কিছু রহিল না। দেবব্রত সত্যবতীকে লইয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। শুভক্ষণে শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ হইল। এই দুইটি ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য দেবব্রতের নাম হইল ভীষ্ম। আর পিতাও খুশী মনে পুত্রকে বর দিলেন, ইচ্ছা না করিলে তাঁহার কিছুতেই মৃত্যু হইবে না।

কিছুকাল পর সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই ছেলে হইল। ছেলে দুটি জন্মিবার পর হঠাৎ শান্তনু মারা গেলেন। ভাই দুইটির ভার পড়িল ভীষ্মের উপর। অতি যত্নে

তিনি তাহাদের লালন-পালন করিতে লাগিলেন। দুই ভাই বড় হইলে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসাইলেন। চিত্রাঙ্গদ ছিলেন ভারী বদরাগী। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল। অগত্যা ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসাইলেন। ক্রমে তাঁহার বিবাহের বয়স হইল। ভীষ্ম ভাইয়ের বিবাহের জন্য মেয়ে খুজিতে লাগিলেন। এই সময় কাশীরাজের তিন মেয়ে অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকার স্বয়ংবর হইতেছিল। ভীষ্ম সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত রাজাদের পরাস্ত করিয়া তিন মেয়েকেই হস্তিনায় লইয়া আসিলেন। অম্বা শাল্বরাজাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে শাল্ব রাজার কাছে পাঠাইয়া দিয়া, বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অম্বালিকা ও অম্বিকার বিবাহ দিলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকার যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ছেলে হইল।

ভাগ্যদোষে বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ—তাই ছোট ভাই পাণ্ডুকে রাজা করিয়া ভীষ্ম রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে দুই ভাই বিবাহের উপযুক্ত হইলেন। গান্ধার রাজের মেয়ে গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের ও যদু বংশের মেয়ে কুন্তী এবং মদ্ররাজার মেয়ে মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হইল। গান্ধারীর দুর্যোধন, দুঃশাসনাদি একশত পুত্র ও দুঃশলা নামে একটি কন্যা হইল। আর যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে কুন্তীর তিন ছেলে এবং নকুল ও সহদেব নামে মাদ্রীর দুই ছেলে হইল। ছেলেরা একটু বড় হইলে রাজা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে সঙ্গে লইয়া একদিন বনে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। মনের দুঃখে মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে চিতার আগুনে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

অনাথ বালকদের লইয়া কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভীষ্ম তাহাদের সমস্ত ভার লইয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। দুর্যোধনের সহিত মৃত রাজার ছেলেদেরও শিক্ষা চলিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কৌরব আর পাণ্ডুর ছেলেরা পাণ্ডব নামে পরিচিত হইল।

এইরূপে দিন যায়। কৌরবদের বড় ভাই দুর্যোধন ছিলেন ভারী দুষ্ট আর হিংসুক। পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠির বড় হইলে রাজা হইবেন, কৌরবদের কিছুই থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়া নিরানব্বুইটি ভাইকে লইয়া দুর্যোধন যুক্তি করেন কি করিয়া পাণ্ডবদের জব্দ করা যায়। পাণ্ডবদের মেজো ভাই ভীম ছিলেন ভয়ানক শক্তিশালী ; তাঁহাকে জব্দ করিতে গিয়া কৌরবরা পদে পদে তাঁহার কাছে নাকাল হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের যত রাগ পড়িল গিয়া ঐ ভীমের উপর—তাঁহাকে শেষ করিতে পারিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। তখন—

হৃদে চিন্তি দুর্যোধন করিল বিচার।
ভীমেরে মারিব হেন যুক্তি করি সার॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা উপায় বাহির করিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রায়ই গঙ্গাতীরে গিয়া বনভোজন ও খেলাধুলা করেন। দুর্যোধন করিলেন কি, পাণ্ডবদের লইয়া একদিন গঙ্গাতীরে বনভোজন করিতে গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া খুব খানিকটা খেলাধুলা ও সাঁতার কাটা হইল। তারপর আরম্ভ হইল খাওয়া-দাওয়া। ভীমের গায়ে যেমন জোর ছিল তেমনি খাইতেও পারিতেন খুব। দুষ্ট দুর্যোধন ভীমের খাবারের সঙ্গে

তীব্র বিষ মিশাইয়া দিলেন। ভীম কিছুই জানিতে পারিলেন না। গপ্ গপ্ করিয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কেবল দুর্যোধন ও দুঃশাসন ঘুমাইলেন না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন ও ভীমের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। বিষের ক্রিয়ায় ভীম ক্রমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন দুই ভাই তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার সময় সকলে ঘুম হইতে উঠিয়া বাড়ী চলিলেন। কিন্তু ভীম কোথায় ? খোঁজ পড়িয়া গেল চারিদিকে। দুর্যোধন বলিলেন—"এখানে তাকে পাবে কোথায় ? সে যা খাম-খেয়ালী। হয়ত এতক্ষণ বাড়ী পোঁছে গেছে।" তাই হবে হয়তো। সকলে রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ভীমের খবর নাই। কুন্তী বলিলেন—"কই, সে তো বাড়ী আসে নাই।" তাইতো, সে গেল কোথায় ? চার ভাই তাঁহাকে খুজিতে বাহির হইলেন। ভাবনা-চিন্তায় কুন্তীর মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন কৌরবরা ভীমকে দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁর কোন অনিষ্ট করিল না তো ! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর আর এক বৈমাত্র ভাই ছিলেন বিদুর ! বিদুরের মত সাধু লোক খুব কমই ছিল সেই সময়। তিনি আসিয়া কুন্তীকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

এদিকে হইল কি—হাত পা বাঁধা অবস্থায় ভীম স্রোতের বেগে একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত। সে জায়গা ছিল নাগদের রাজ্য। নাগরাজ বাসুকী ছিলেন তাহাদের রাজা। কতকগুলি নাগ সেখানে বসিয়া জটলা করিতেছিল। ভীম

গিয়া পড়িলেন একেবারে তাহাদের ঘাড়ে। কয়েকটা নাগ তো একেবারে চেপ্টা হইয়া গেল। ক্ষেপিয়া উঠিল নাগেরা। ভীমকে ঘিরিয়া সকলে মারিতে লাগিল ছোবলের পর ছোবল। বিষে বিষক্ষয় হইল। নাগের বিষে ভীমের শরীরের বিষ নষ্ট হইয়া গেল। তিনি হাত-পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর নাগদের ধরিয়া এমন মার দিলেন যে তাহারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।



নাগরাজ বাসুকী এই খবর পাইয়া ভীমকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন ও আদর-যত্ন করিয়া শান্ত করিলেন। বাসুকীর ঘরে ভাণ্ডার ভরা অমৃতের জালা ছিল। সেই অমৃত খাইয়া ভীমের গায়ের জোর আরও বাড়িয়া গেল। তারপর বাসুকী বহু ধন-রত্ন উপহার দিয়া ভীমকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে পাইয়া অন্য ভাইদের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল

—মাতা শান্ত হইলেন। কিন্তু বিদুরের কথায় তাঁহারা এই ঘটনা একেবারে চাপিয়া গেলেন।

ক্রমে ছেলেরা বড় হইয়া উঠিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। কৃপাচার্য হইলেন তাঁহাদের অস্ত্র শিক্ষক; ছেলেরা সকাল বিকাল আচার্যের কাছে অস্ত্র-চালনা শিখেন, আবার মাঝে মাঝে এমনিও মাঠের মধ্যে খেলাধুলা করেন। একদিন তাঁহারা একটা লোহার গোলা লইয়া খেলিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে গোলকটি একটি শুক্‌না কূয়ার ভিতর পড়িয়া গেল। বহু চেষ্টাতেও কুমারেরা গোলাটি তুলিতে পারিলেন না। এক ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বীরের মত তাঁহার চেহারা। হাতে ধনুর্বাণ। ছেলেদের অনুরোধে তিনি বাণের পর বাণ মারিয়া প্রথমে গোলাটি তুলিয়া দিলেন। তারপর নিজের হাতের আংটিটি কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহাও ঐভাবে তুলিয়া আনিলেন।

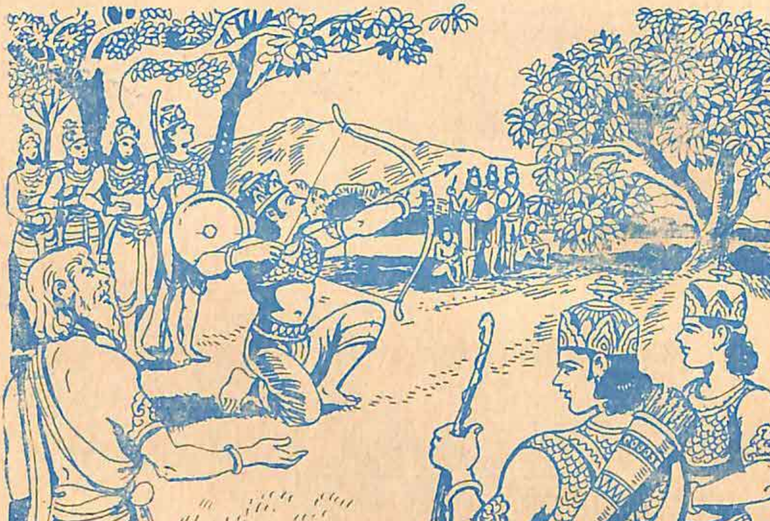
ব্রাহ্মণের ক্ষমতা দেখিয়া ছেলেরা তো অবাক। তাঁহারা তখনি গিয়া ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন। ভীষ্ম আসিয়া দেখেন এ যে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। মনে মনে তিনি ইঁহারই খোঁজ করিতেছিলেন। তখন—

দ্রোণে দেখি প্রণমিল গঙ্গার নন্দন।
আশীর্বাদ করি দ্রোণ দেন আলিঙ্গন॥

ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের উপর কুমারদের শিক্ষার ভার দিয়া খুশী ও নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্রোণ ছিলেন কৃপাচার্যের আপন ভগ্নীপতি। তাঁহাকে দেখিয়া তিনিও খুব খুশী হইলেন। তাঁহার কথায় দ্রোণ স্ত্রী এবং পুত্র অশ্বত্থামাকেও সেখানে লইয়া আসিলেন। যথা

নিয়মে কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা চলিতে লাগিল। গুরু দ্রোণের নাম শুনিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে রাজকুমারেরা হস্তিনায় আসিয়া অস্ত্রচালনা শিখিতে লাগিলেন। গুরু দ্রোণ দেখিলেন, এই সব ছেলের মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মত আর কেহই নয়। যেমন তাঁহার গুরুভক্তি, তেমনি তাহার একাগ্রতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি। আনন্দিত মনে তিনি তাঁহার যা-কিছু বিদ্যা অর্জুনকে শিখাইতে লাগিলেন।



একদিন দ্রোণ শিষ্যদের একাগ্রতা পরীক্ষার জন্য এক মস্ত উঁচু গাছের মগডালে একটি কাঠের পাখী বসাইয়া রাখিলেন। তারপর শিষ্যদের একে একে ডাকিয়া আনিয়া উহার চোখটি বিঁধিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর কেহই তাহা করিতে পারিলেন না। অর্জুন স্থির লক্ষ্যে পাখীটির

চোখ বিঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। দ্রোণাচার্য আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"এ জগতে তুমিই হবে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য। তুমি চিরজয়ী হও।"

তারপর দ্রোণ আর একদিন শিষ্যদের লইয়া গঙ্গা-স্নানে গেলেন। শিষ্যদের তীরে দাঁড়াইতে বলিয়া তিনি জলে নামিলেন। সহসা এক মস্ত কুমীর তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিল। গুরু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে আমাকে কুমীরে ধরেছে। ওটাকে মেরে আমার প্রাণ বাঁচা।" হঠাৎ একি বিপদ! ছেলেরা সব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অর্জুন তখনি বাণের পর বাণ মারিয়া কুমীরটাকে মারিয়া ফেলিলেন। কুমারদের উপস্থিত বুদ্ধির পরীক্ষা এইভাবে হইল। সন্তুষ্ট হইয়া দ্রোণ অর্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করিলেন।

এইভাবে অর্জুন ক্রমেই গুরুর খুব প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কথায় কথায় গুরু প্রায়ই বলিতেন—"এত সব রাজা-মহারাজার ছেলে তো রয়েছে, কিন্তু অর্জুনের মত আর দুটি দেখলাম না—যেমন শাস্ত্র-জ্ঞানে, তেমনি অস্ত্র-চালনায়। যা ধরবে শেষ না করে ছাড়বে না। দিনরাত ধনুর্বাণ নিয়েই আছে। তার উপর—গুরু সেবা। মনে-প্রাণে সে আমাকে ভক্তি করে।" ভাইয়ের প্রশংসায় পাণ্ডবদের মন গর্বে ভরিয়া উঠে। কিন্তু কৌরবেরা হিংসায় পুড়িয়া মরে। আর ফন্দি আঁটে কি করিয়া পাণ্ডবদের জব্দ করা যায়।

ক্রমে রাজকুমারদের শিক্ষা শেষ হইল। এইবার সকলের সম্মুখে তাঁহাদের পরীক্ষা হইবে। রাজপুরীর সম্মুখে মাঠের মধ্যে খেলা দেখানোর বন্দোবস্ত হইল। রাজ্যের লোক আসিয়া ভিড়

করিল সেখানে। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র আসিতেই খেলা আরম্ভ হইল। রাজপুত্রেরা একে একে নিজ নিজ অস্ত্রকৌশল দেখাইয়া সকলের প্রশংসা পাইলেন। কিন্তু সবার চাইতে বেশী প্রশংসা পাইলেন অর্জুন। একবাক্যে সকলে বলিতে লাগিলেন—"এমনটি কখনো দেখিনি—আর দেখব বলে আশাও করি না।" জনতার প্রশংসা-ধ্বনির মধ্যে—

অর্জুনের বিদ্যা যদি হইল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ হইল আগুয়ান॥

কর্ণ আসিয়া অর্জুনকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিলেন। জনতা হৈ হৈ করিয়া উঠিল। গুরু দ্রোণ ইহাতে ভারী বিরক্ত হইলেন। গোলমাল লাগিয়া যায় আর কি! কৃপাচার্য বলিলেন—"এখানে আচার্য শিষ্য রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা নিচ্ছেন, রাজকুমারদের সঙ্গে রাজকুমারেরই প্রতিযোগিতা করা চলে। সারথি অধিরথের পালিত-পুত্র কর্ণ কোন্ সাহসে দ্বন্দ্বে অগ্রসর হয়?"

লজ্জায় কর্ণের মাথা নত হইয়া আসে। সুযোগ বুঝিয়া দুর্যোধন বলিলেন—"আমি কর্ণকে অঙ্গ রাজ্য দান করলাম। এখন প্রতিযোগিতা চলুক। দেখি হারজিত কার হয়।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গুরু দ্রোণ খেলা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে কর্ণ দুর্যোধনের পরম বন্ধু হইলেন এবং দুইজনে মিলিয়া পাণ্ডবদের সর্বনাশ করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। এইভাবে কুরু-পাণ্ডবের বিবাদ পাকা হইয়া উঠিল।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ছিলেন দ্রোণের ছেলেবেলার বন্ধু। তিনি রাজা হইলে একবার দ্রোণ তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিতে যান। কিন্তু দ্রুপদ তাঁহাকে অপমান করিয়া

তাড়াইয়া দেন। এইবার দ্রোণের সেই প্রতিশোধ লইবার পালা। তাঁহার আদেশে কুরু-পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে দ্রুপদ পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। শেষে দ্রোণকে রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইলেন। তিনি ছিলেন ধীর, স্থির আর অত্যন্ত ধার্মিক। সকলে তাঁহাকে বলিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। পাণ্ডবদের প্রশংসায় দেশ ভরিয়া উঠিল, ইহাতে দুর্যোধনরা ক্ষেপিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পিতা ধৃতরাষ্ট্রও হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন।

দুর্যোধনের মামা দুষ্টবুদ্ধি শকুনি ছিলেন ভারী পাকা পাশা খেলোয়াড়। তিনিও ছিলেন কৌরবদের দলে। সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেন, যেমন করিয়াই হউক পাণ্ডবদের শেষ করিতে হইবে। কিন্তু কাজটি করা চাই খুব গোপনে—যাহাতে বাহিরের কেউ টের না পায়। গঙ্গার তীরে বারণাবত নগর। নগরের চারিদিকে নানারকম ফল ফুলের গাছ। মাঝখানে মস্ত বড় দীঘি। স্ফটিকের মত তার জল, তাহাতে সাদা পদ্মের বন। দীঘির পাড়ে মহেশ্বর শিবের বিরাট মন্দির। ভারী সুন্দর দৃশ্য সেখানকার। কৌরবেরা পরামর্শ করিয়া যখন-তখন বারণাবত নগরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বারণাবতের প্রশংসা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের সেখানে যাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি গিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন—তাঁহার বারণাবতে যাওয়ার বাসনা। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত হইয়া বলিলেন —"বারণাবতের কথা আমিও শুনেছি। জায়গাটা নাকি ভারী

২

চমৎকার, তোমার যখন যাবার ইচ্ছা হয়েছে, তখন আমি বলি কি, তোমার মাকে ও ভাইদের সঙ্গে নিয়ে যাও। সামনেই আসছে শিবচতুর্দশী, একই সঙ্গে দু-কাজ হবে, সেখানে তোমাদের মা শিবচতুর্দশী ব্রতও করে নেবেন। তবে একটি কথা—সেখানে তোমাদের থাকবার মত ঘর-বাড়ী তো তেমন নেই। আগে সে সব তৈরী হোক, তারপর যেও।” ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা ফাঁদে পড়িয়াছে দেখিয়া কৌরবেরা মহা খুশী। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন শিব-মন্দিরের কিছু দূরে পাণ্ডবদের জন্য বাড়ী তৈয়ার করিতে হইবে। ঘরগুলি তৈয়ার করিতে হইবে বাঁশ বেত ও কাঠ দিয়া। চাল হইবে খড়ের ; আর ঘি, গালা, ধূনা ও চর্বির সঙ্গে মাটি মিশাইয়া ঘরের দেওয়ালে লাগান হইবে। দেওয়ালের গায়ে রং দিয়া তাহাতে নানা রকম চিত্র-বিচিত্র করিলেই আর কেউ কিছু বুঝিতে পারিবে না। সেই বাড়ীতেই পাণ্ডবদের থাকিতে দেওয়া হইবে। তারপর সুযোগ বুঝিয়া একদিন ঘরে আগুন দিলেই কাজ শেষ।

মন্ত্রী পুরোচন ছিলেন এই সব কাজে কৌরবদের দক্ষিণ হস্ত। দুর্যোধন তাঁহার উপর সমস্ত কাজের ভার দিয়া বলিলেন —“খুব সাবধান, পাণ্ডবদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করবে। তারা ঘুণাক্ষরেও যেন আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা টের না পায়।” লোকজন ও জিনিসপত্র লইয়া পরদিনই পুরোচন বারণাবত নগরে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে সেখানে কৌরবদের কথামত বাড়ী তৈয়ারী হইয়া গেল। চমৎকার

বাড়ী, দেখিলে আর চোখ ফেরান যায় না। খবর গেল যুধিষ্ঠিরের কাছে। চার ভাই ও মাকে লইয়া তিনি বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন।

ধার্মিক বিদুর কিন্তু ভিতরে ভিতরে সব টের পাইয়াছিলেন। তিনি গোপনে পাণ্ডবদের সাবধানে থাকিতে বলিয়া দিলেন। পাণ্ডবেরা বারণাবতে পৌঁছিতেই পুরোচন মহাসমাদরে তাঁহাদের সেই বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং অতিশয় সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা কিন্তু খুব সতর্ক রহিলেন। সেখানে তাঁহারা সকাল বিকাল নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ান। এইভাবে সেখানকার পথঘাট সব তাঁহাদের চেনা হইয়া গেল। কিছুদিন পর বিদুর পাণ্ডবদের কাছে একজন লোক পাঠাইলেন। লোকটি মাটির নীচ দিয়া চমৎকার সুরঙ্গ কাটিতে পারে। গোপনে সে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করিল ও তাঁহাদের কথামত ঘরের মেঝে হইতে আরম্ভ করিয়া মাটির নীচ দিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত সুন্দর সুরঙ্গ কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে শিবরাত্রি আসিয়া পড়িল। ব্রতপালন করিয়া কুন্তী গরীব-দুঃখীদের পেট ভরিয়া খাওয়াইলেন। সারাদিন ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া চলিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সকলে চলিয়া গেল। এক ব্যাধের স্ত্রী তাহার পাঁচটি ছেলে লইয়া অপরাহ্নে খাইতে আসিয়াছিল। রাত্রি হইল দেখিয়া তাহারা আর বাড়ী গেল না। পাণ্ডবদের অগোচরেই এক ঘরে ছেলেদের লইয়া শুইয়া রহিল।

গভীর রাত্রি। সব চুপচাপ। পুরোচন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছেন। এই উপযুক্ত সময়। সকলে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন—

বৃকোদর পুরোচন দ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্তে প্রবেশিল॥

সুরঙ্গ পথে পাঁচ ভাই মাকে লইয়া একেবারে গঙ্গাতীরে গিয়া বাহির হইলেন। নদীর ঘাটে একখানা নৌকা লাগানো ছিল। মাঝিটি বিদুরের লোক। সে তাঁহাদের নদী পার করিয়া দিল। ওপারে গিয়া পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিলেন। রাত্রি ভোর হইবার পূর্বেই তাঁহাদের এই অঞ্চল ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

এদিকে ভীমের লাগানো আগুনে সমস্ত বাড়ীখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! সেই আগুনে পুরোচন সহ ব্যাধ পরিবার পুড়িয়া মরিল। নগরের লোক হায় হায় করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায়ও তাহারা আগুন নিভাইতে পারিল না। ব্যাধদের পোড়া হাড়গোড় দেখিয়া সকলে মনে করিল পাণ্ডবেরা আর বাঁচিয়া নাই। খবর গেল হস্তিনায়। কৌরবেরা যেন বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু বাহিরে বহু কান্নাকাটি করিয়া খুব জাঁক-জমকের সহিত পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধ-শান্তি করিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা পথ চলিতে চলিতে ভোরবেলা এক মস্ত বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। পথ চলার পরিশ্রমে কুন্তীসহ চার ভাই এক গাছের নীচে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভীম বসিয়া তাঁহাদের পাহারা দিতে লাগিলেন। এই বনে ছিল দুষ্ট রাক্ষস হিড়িম্বের বাস। ভীমের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হিড়িম্বকে বধ করিয়া ভীম তাহার ভগ্নী হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলেন। যথাকালে ঘটোৎকচ নামে তাঁহাদের এক ছেলে হইল। ভীম মা ও ভাইদের লইয়া আবার বাহির হইলেন। নানা দেশ ঘুরিয়া একচক্রা নামে

এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সেই দেশে বক নামে এক রাক্ষস আসিয়া ভারী উপদ্রব করিতেছিল। রাক্ষসটা রোজ এক গাড়ি খাবার ও একটি মানুষ খাইত। রাজ্যের লোককে পালা করিয়া এই জন্য প্রত্যহ একটি মানুষ ও খাবার যোগাইতে হইত। সেইদিন সেই ব্রাহ্মণের পালা পড়ায় পরিবারের মধ্যে কান্নার রোল উঠিল। কাহাকে রাখিয়া কে যাইবে রাক্ষসের মুখে! এই কথা শুনিয়া কুন্তী ভীমকে পাঠাইলেন খাবারের গাড়ীর সঙ্গে। ভীম বক-রাক্ষসকে বধ করিয়া সকলের ভয় দূর করিলেন।

রাক্ষস বধ করিয়া পাণ্ডবেরা সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। চলিতে চলিতে পাঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হইয়া এক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সেই রাজ্যে তখন ভারি ধুমধাম। রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, দেশ বিদেশের রাজা মহারাজা নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিয়াছেন। রাজবাড়ীর সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ, উহার চারিদিক ঘিরিয়া রাজাদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। মাঠের মাঝখানে একটি বড় জলের কুণ্ড। কুণ্ডের বহু উপরে স্থাপিত হইয়াছে একটি যন্ত্র। যন্ত্রটির মধ্যে একটি চক্র অনবরত ঘুরিতেছে। চক্রের ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র। তাহার মধ্য দিয়া মাত্র একটি তীর যাইতে পারে। যন্ত্রের উপর ঝুলান আছে একটি মাছ। যিনি জলের মধ্যে ছায়া দেখিয়া চক্রের ছিদ্রপথে মাছটির চোখ বিঁধিতে পারিবেন তিনিই লাভ করিবেন দ্রৌপদীকে। তাই—

জানিয়া দ্রুপদ রাজার এইমত পণ।
সভাস্থলে রাজগণ কৈল আগমন॥

রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন একখানি বিশাল ধনুক ও বাণভরা

একটি তূণ আনিয়া কুণ্ডের পাশে রাখিলেন। চারিদিকে মধুর শব্দে বাজনা বাজিয়া উঠিল। সখীদের সঙ্গে বিবাহ বেশে সজ্জিতা দ্রৌপদী সভাস্থলে প্রবেশ করিলে তাঁহার রূপে রাজারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য তাঁহারা একে একে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই সফলকাম হইলেন না।

একদিকে পাণ্ডবেরাও ব্রাহ্মণের বেশে সভায় বসিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। রাজারা সকলে হার মানিলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন উঠিয়া গিয়া লক্ষ্যভেদ করিলেন।



চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ভিখারী ব্রাহ্মণকুমার দ্রৌপদীকে লইয়া যায় দেখিয়া রাজন্যবর্গ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। সকলে একযোগে অর্জুনকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন। ভায়ের বিপদ দেখিয়া ভীম আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার পাশে; দেখিতে দেখিতে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

দুই ভাইয়ের বিক্রমে রাজারা পরাস্ত হইয়া পলাইয়া গেলেন।

পাঁচ ভাই তখন দ্রৌপদীকে লইয়া সেই কুম্ভকারের বাড়ীতে ফিরিলেন। বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া যুধিষ্ঠির কুন্তীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা বেরিয়ে দেখ, কি চমৎকার ভিক্ষা এনেছি।" কুন্তী দেখিতে আসিলেন না, ঘরের ভিতর হইতে কহিলেন—"চমৎকার ভিক্ষা এনেছ ত পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও।" কি বিপদ, এক কন্যা পাঁচ ভাই ভাগ করিয়া লইবেন কি করিয়া, আর মায়ের আদেশই বা অবহেলা করেন কিরূপে! মহা বিপদে পড়িলেন যুধিষ্ঠির। তখন ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি বলিলেন—"যা হবার তা' ত হয়ে গিয়েছে। এখন পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হোক, তবেই গোল মিটিয়া যায়।" পরদিন রাজা দ্রুপদ সকলকে রাজপুরীতে লইয়া গেলেন এবং পরিচয় পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। যথাসময়ে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়া গেল।

এই খবর পাইয়া কৌরবদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কি করা যায় এখন? শেষে ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদের হস্তিনায় ফিরাইয়া আনিলেন। কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য সমান দুই ভাগে ভাগ হইল। পাছে কৌরবদের সঙ্গে আবার গোলমাল হয়, এইজন্য পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের সুশাসনে প্রজারা মহানন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

এইভাবে দিন যায়, কিছুদিন পর অর্জুন বাহির হইলেন তীর্থভ্রমণ করিতে। দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া আসিলেন প্রভাসতীর্থে।

এই সময় অর্জুন নাগকন্যা উলুপী ও মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে তাঁহার এক ছেলে হইল।

প্রভাসতীর্থ যদুবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার নিকটে। অর্জুনের খবর পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিলেন এবং মহাসমাদরে তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সৎবোন সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের দেখা হইলে দুইজনেই দুইজনকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু গোল বাধিল বিবাহ লইয়া। শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম দুর্যোধনকে গদা-যুদ্ধ শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ভগ্নী সুভদ্রাকে দুর্যোধনের সহিত বিবাহ দেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন একদিন সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলেন।

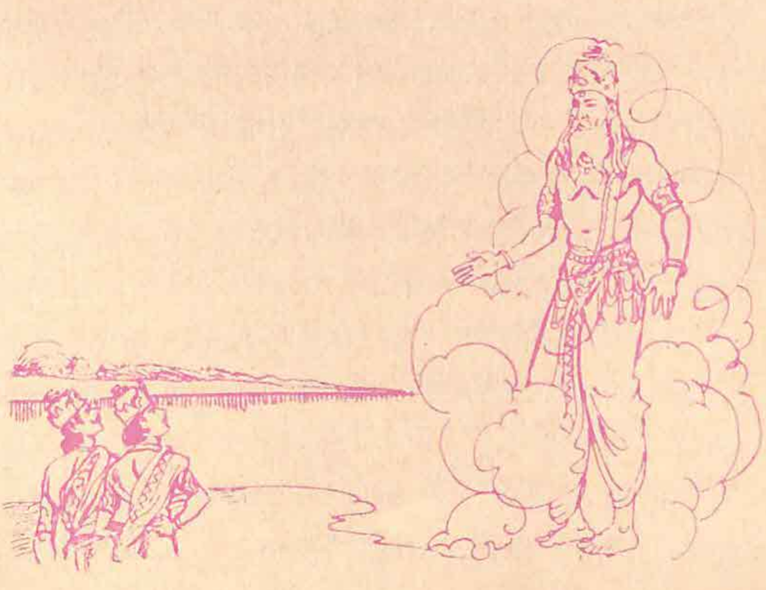
যদুবংশীয়দের যাদব বলা হয়। যাদবেরা বাধা দিল বটে কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। শেষে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন এবং বলরাম সহ যাদবগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর যাদবদের লইয়া বলরাম দেশে চলিয়া গেলেন। পাণ্ডবদের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আরও কিছুদিন থাকিতে হইল।

ক্রমে সুভদ্রার গর্ভে অর্জুনের অভিমন্যু নামে একটি ছেলে হইল; দ্রৌপদীও পাঁচটি ছেলে প্রসব করিলেন। ছেলেদের রূপ দেখিয়া সকলেই খুশী।

একদিন পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনায় জল-খেলা করিতে গেলেন। সকলে আমোদ-আহ্লাদে ব্যস্ত, শ্রীকৃষ্ণ ও

অর্জুন যমুনাতীরে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহাদের নিকট এক বিশাল জটাজুটধারী পুরুষ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার গায়ের রং কাঁচা সোনার মত উজ্জ্বল। তিনি পরিচয় দিলেন—“আমি অগ্নি, বার বৎসর যাবৎ রাজা শ্বেতকেতুর যজ্ঞে ঘি খাইয়া আমার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে। খাণ্ডব নামে যে মস্ত বড় বন আছে তাহা পশুপক্ষী সমেত আমাকে খাইতে দিলে আমি নিরাময় হইতে পারি। আপনারা ইহার ব্যবস্থা করুন।”

অগ্নিদেব অর্জুনের জন্য গাণ্ডীব ধনুক ও বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণ, আর শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুদর্শন চক্র এবং কপিধ্বজ রথ আনিয়া দিলেন। কৃষ্ণার্জুন অগ্নির ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত পশুপক্ষী সহ খাণ্ডব বন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের চক্র আর অর্জুনের বাণ এড়াইয়া কেহই পলাইতে পারিল না। ময় নামে একটি দানব কেবল রক্ষা পাইয়াছিল।





সভা পর্ব

অর্জুনের দয়ায় ময়দানবের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। সে এখন অর্জুনের জন্য একটা কিছু করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দানবদের মধ্যে তোমার মত কারিগর খুব কমই আছে। তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটা রাজসভাগৃহ তৈয়ার করে দাও যা দেখে সকলে যেন মুগ্ধ হয়ে যায় ; এই হলেই অর্জুনের কাজ করা হবে।" আনন্দিত মনে ময়দানব রাজী হইয়া চলিয়া গেল। বহুকাল দেশ ছাড়া, তাই শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবদের কাছে বিদায় লইয়া দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পর ময়দানব তাহার লোকজন লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। যুধিষ্ঠির রাশি রাশি সোনা, রূপা, হীরা আর

মণিমুক্তা আনিয়া দিলেন। ময়দানব সেইসব দিয়া চৌদ্দ মাসে একটি অপূর্ব সুন্দর রাজসভা তৈয়ার করিল। মণি-মাণিক্য খচিত রাজসভাটি ইন্দ্রের অমরাবতীকেও হার মানাইল। দেশ-বিদেশের লোক সেই সভাগৃহ দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। শুভদিনে শুভক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

এই সময় একদিন দেবর্ষি নারদ আসিলেন সভাগৃহ দেখিতে, চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি সভাগৃহটি দেখিলেন। পরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"ধর্মরাজ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর—এই তিনযুগে আর কেহ এমনটি করতে পারেনি। মাত্র তুমিই এই অসাধ্য সাধন করলে। আমি বলি কি, তুমি যদি রাজসূয় যজ্ঞ কর তবেই এই সভার সার্থকতা হয়।" নারদ চলিয়া গেলে যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন নারদের কথামত কাজ করিতে হইবে। এখন শ্রীকৃষ্ণের মতামত জানা বিশেষ প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকায় লোক পাঠান হইল, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আসিবার জন্য।

ধর্মরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিলে যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু রাজচক্রবর্তী সম্রাট ছাড়া কেহই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারে না। যুধিষ্ঠিরকে তাই আগে রাজচক্রবর্তী হইতে হইবে। কিন্তু এতে প্রথম বাধা—মগধরাজ জরাসন্ধ—মস্ত যোদ্ধা তিনি। তাঁহার স্বভাবও ছিল ভারি উগ্র। একশো আট-জন রাজাকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া তিনি রাজধানী রাজগৃহে আনিয়া রাখিয়াছেন; যজ্ঞে নাকি বেচারাদের বলি দেওয়া হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে লইয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। ভীমের সহিত জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের হাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। ভীম তাঁহাকে দুই ফালি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া বন্দী রাজাদের মুক্তি দিলেন। মুক্ত রাজাগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং উপযুক্ত কর ও উপহার সহ রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ভীম ও অর্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার পরামর্শ লইয়া চার ভাইকে দিগ্বিজয় করিতে পাঠাইলেন চারিদিকে। অর্জুন উত্তরে, ভীম পূর্বে, নকুল দক্ষিণে আর সহদেব পশ্চিমে। বহু রাজা-মহারাজা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে হারিয়া গিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কর ও উপহার লইয়া রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইতে রাজী হইলেন। চার ভাই দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। চারিদিক হইতে রাজা মহারাজা ও মুনি ঋষিরা ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া মিলিত হইলেন। রাজারা সকলে যুধিষ্ঠিরকে এত ধন রত্ন উপহার দিলেন যে রাজভাণ্ডারে আর তা' ধরে না।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আর দুর্যোধনেরা শত ভাই আসিয়া যজ্ঞে এক একটি কাজের ভার লইলেন। এখন প্রথম কাজ হইল, মিলিত রাজাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে মান্য তাঁহাকে প্রধান অর্ঘ্য বা উপহার দেওয়া। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে এই

বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভীষ্ম বলিলেন—

সর্বযজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ জগতে বাখানে।
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান কর তাঁহার চরণে॥

ভীষ্মের কথায় ধর্মরাজ শ্রীকৃষ্ণকেই প্রধান অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন।

চেদিরাজ শিশুপালের কিন্তু ইহা মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি উঠিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং ভীষ্ম আর শ্রীকৃষ্ণকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া গালমন্দ করিতে লাগিলেন। আরও কতক দুষ্টরাজা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। মহা হট্টগোলে যজ্ঞ পণ্ড হয় আর কি! শ্রীকৃষ্ণ তখন সুদর্শন চক্র দিয়া শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাকী সকলে একেবারে চুপ। তারপর নির্বিঘ্নে যজ্ঞ শেষ হইল। যুধিষ্ঠিরকে সকলেই সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও উপস্থিত সকলে যে যাঁহার দেশে চলিয়া গেলেন।

হস্তিনায় ফিরিয়া দুর্যোধনের মনে আবার হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যাহাদের ধ্বংস করিবার জন্য তিনি কত কিছুই না করিয়াছেন, আজ তাঁহারা উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া যেন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। রাগে দুঃখে দুর্যোধন অস্থির হইয়া উঠিলেন। তারপর কর্ণ দুঃশাসন ও শকুনিকে ডাকিয়া তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন কেমন করিয়া পাণ্ডবদের জব্দ করা যায়।

শকুনি ছিলেন কৌরবদের মামা, গান্ধারীর আপন ভাই। তিনি ছিলেন ভারি দুষ্টবুদ্ধি, আর পাকা পাশা খেলোয়াড়।

তখনকার দিনে বাজি রাখিয়া পাশাখেলা হইত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নিয়ম ছিল, পাশা খেলার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা আর বিনা যুদ্ধে পলাইয়া যাওয়া একই কথা। কুচক্রী শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। কাজেই যুধিষ্ঠির ভাইদের লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন।

যথাসময়ে খেলা আরম্ভ হইল। একদিকে যুধিষ্ঠির, অন্য-দিকে দুর্যোধনের প্রতিনিধি মামা শকুনি ; বাজি রাখিয়া খেলা



চলিতে লাগিল। শকুনির কপট খেলায় প্রত্যেকবারেই যুধিষ্ঠিরের হার হইতে লাগিল। যত হার হয় ততই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠেন আর নূতন করিয়া বাজি রাখিয়া খেলেন। আবার হারিয়া যান। খেলিতে খেলিতে—

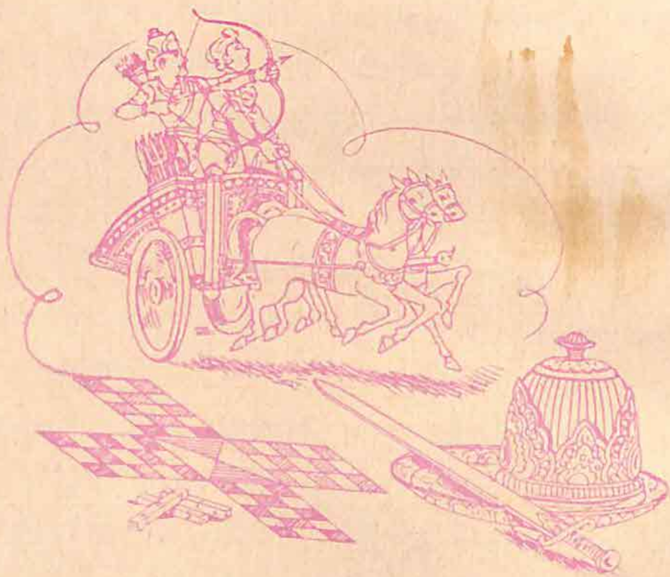
যত কিছু ছিল তাঁর রাজ্য ধন জন।
একে একে হারাইল ধর্মের নন্দন ॥

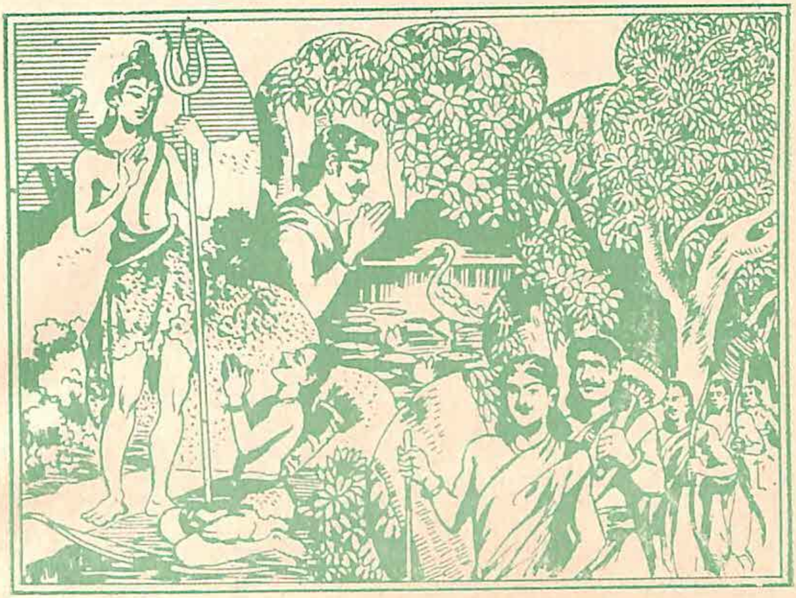
শেষে এমন অবস্থা হইল যে নিজেকে ও চার ভাই সহ দ্রৌপদীকেও পর্যন্ত বাজি রাখিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া গেলেন।

খেলায় জয়লাভ করিয়া দুর্যোধন অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলেন। কর্ণের পরামর্শে তিনি পঞ্চপাণ্ডবের রাজ পোশাক কাড়িয়া লইয়া সাধারণ লোকের আসনে বসাইয়া দিলেন। রাগে দুঃখে চার ভাই একেবারে অগ্নিশর্মা। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে রাজ-সভায় লইয়া আসিবার জন্য দুঃশাসনকে পাঠাইলেন। দুঃশাসন তাঁহাকে রাজসভায় ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং চূড়ান্ত অপমান করিলেন। এইবার আর সহ্য হইল না। ভীম ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জিয়া উঠিলেন—"শোন সকলে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি —এই দুষ্ট দুঃশাসনকে বধ করে তার বুকের রক্ত পান করব। আর দুষ্ট দুর্যোধনের উরু দুখানি গদার আঘাতে চুরমার করে তাকে বধ করব।"

সভার লোকজন কৌরবদের নামে ধিক্কার দিতে লাগিল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভারি ভয় হইল। তিনি দ্রৌপদীকে ডাকিয়া সমস্ত পণ হইতে মুক্তি দিলেন। পণমুক্ত হইয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলেন। ইহাতেও কিন্তু শান্তি হইল না। দুর্যোধন আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে আপত্তি করিলেও যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আবার হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। এবার পণ রহিল যাঁহারা হারিবেন তাঁহাদের বার বৎসরের জন্য বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অজ্ঞাতবাসের সময় ধরা পড়িলে আবার বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।

শকুনির কপটতায় এবারও যুধিষ্ঠিরের হার হইল। তিনি সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য হারাইয়া দ্রৌপদী ও ভাইদের লইয়া বনবাসে রওনা হইলেন। সঙ্গে গেলেন পুরোহিত ধৌম্য ঋষি, আরও অনেক ব্রাহ্মণ সজ্জন। কুন্তী রহিলেন বিদুরের বাড়ীতে। আর সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যুকে লইয়া দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে চলিয়া গেলেন। আনন্দ পরিপূর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল।

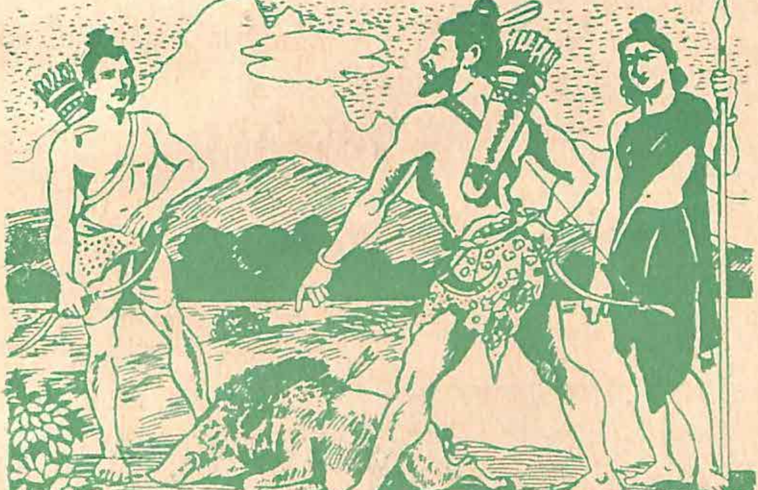




বন পর্ব

ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবেরা অস্ত্র হাতে বনের দিকে চলিতে লাগিলেন। পুরোহিত ও অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে খুবই কষ্ট হইল। নিজেদের থাকিবার খাইবার কোন সংস্থান নাই, তার উপরে এত লোকজন লইয়া তিনি বনবাসে কি উপায় করিবেন এই চিন্তাতে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন পুরোহিত ধৌম্য তাঁহাকে সূর্যদেবের উপাসনা করিতে বলিলেন। যুধিষ্ঠিরের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, তোমার পূজায় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাকে একটি পাত্র দিচ্ছি, এর গুণ অদ্ভুত। প্রতিদিন এতে রান্না করো, দ্রৌপদী না খাওয়া পর্যন্ত রান্না করা খাদ্য কিছুতেই শেষ হবে না।"

ভগবতীও কিরাত রমণীর বেশে মহাদেবের সঙ্গ নিলেন। হঠাৎ একটি শূকর ভয়ঙ্কর শব্দে তপস্যারত অর্জুনকে আক্রমণ করার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অর্জুন গাণ্ডীব তুলিয়া তাহাকে মারিতে প্রস্তুত হইলেন। সহসা এক ভীমাকৃতি কিরাত বনের অন্তরাল হইতে চীৎকার করিয়া কহিল—"এই শূকরটি আমিই তাড়িয়ে এনেছি। ইহা আমার শিকার, তুমি তীর ছুঁড়িও না।" শব্দ্য লক্ষ্য করিয়া তাকাইতেই অর্জুন ভীষণ মূতি এক কিরাতকে দেখিতে পাইলেন। সামান্য কিরাতের কথা অগ্রাহ্য করিয়া অর্জুন বাণ ছুঁড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিরাতের বাণও আসিয়া শূকরের উপর পড়িল।



ইতিমধ্যে কিরাতও আসিয়া অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইল। শিকার লইয়া উভয়ের ঝগড়া করিতে করিতে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অর্জুন যত বাণ মারেন কিরাত বাণগুলি

পাণ্ডবেরা বনে উপস্থিত হইতেই বহু মুনিঋষি আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। অনেকে আবার তাঁহাদের সঙ্গীও হইলেন।

এইরূপে বনে আসিয়াও সর্বদা সদালাপ ও সৎসঙ্গে পাণ্ডবদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতে লাগিল। বনবাস যাত্রার তৃতীয় দিনে তাঁহারা কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বক রাক্ষসের ভাই কির্মির ভীমের হাতে নিহত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বদৈত্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। শাল্বকে বধ করিয়াই তিনি পাণ্ডবদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং কৌরবদের অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। পরে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই, ধর্মরাজ। দুষ্টরা বড় বেশী বেড়ে উঠেছে। ধ্বংসের আর বেশী দেরী নাই—এ আমি দিব্য চক্ষে দেখছি।" এইরূপ নানা কথায় পাণ্ডবদের প্রবোধ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেশে চলিয়া গেলেন।

বর্ষা আরম্ভ হইতেই পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গিয়াই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ইন্দ্রের আরাধনা করিতে পাঠাইলেন। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একটি বিশেষ মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন। ঐ মন্ত্র জপ করিলে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হন। তিনি অর্জুনকে ঐ মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। অর্জুনের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে মহাদেবের তপস্যা করিতে বলিলেন।

ইন্দ্রের কথায় অর্জুন আরও গভীর বনে গিয়া মহাদেবের তপস্যায় মন দিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন মহাদেব কিরাতের বেশে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন।

সব গিলিয়া ফেলে। কাণ্ড দেখিয়া অর্জুন তো অবাক! তখন তিনি কিরাতকে ডাকিয়া বলিলেন—"দাঁড়া, আমি মহাদেবের পূজা শেষ করে নি—তারপর মজা দেখাচ্ছি।" এই বলিয়া অর্জুন মাটির শিবের গলায় একটি বন-ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। কী আশ্চর্য! মাটির শিবের গলায় মালা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা গিয়া কিরাতের গলায় শোভা পাইতে লাগিল! বুদ্ধিমান অর্জুনের বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাঁহার ইষ্টদেবই কিরাতরূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তিনি কিরাতের চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। মহাদেবও নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন—"অর্জুন, তোমার বীরত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি ইচ্ছামত বর চাও।"

অর্জুন কহিলেন—"আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, প্রভু, তবে আমাকে আপনার পাশুপত অস্ত্র দিন।"

মহাদেব তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

পাশুপত অস্ত্র লাভ করার পর, দেবরাজ ইন্দ্র রথ পাঠাইয়া অর্জুনকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। স্বর্গে তখন দেবাসুরের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে অর্জুন দেবতাদের পক্ষে থাকিয়া ভীষণ যুদ্ধে অসুররাজ নিবাত কবচকে বধ করেন।

ইহাতে দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া অর্জুনকে নানা অস্ত্রশস্ত্র উপহার দেন।

এদিকে চারিভাই অর্জুনের অনুপস্থিতিতে নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া কাম্যক বনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ আসিয়া নানা তীর্থের কথা যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। এই সকল মহাতীর্থের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির সকলকে লইয়া তীর্থ

ভ্রমণে বাহির হইলেন। বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা বদরীকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে লোমশ মুনির সঙ্গে ধর্মকথা আলোচনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন সকলে মিলিয়া একত্রে বসিয়া গল্পসল্প করিতেছেন—এমন সময় উত্তরদিক হইতে অপূর্ব সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তখন লোমশ মুনি তাঁহাদের বলিলেন —"গন্ধমাদন পর্বতে শত শত সোনার পদ্ম ফুটিয়া আছে ইহা তাহারই গন্ধ।" মুনির কথা শুনিয়া দ্রৌপদী ভীমকে কহিলেন—"আমাকে ঐ পদ্ম এনে দাও। আমি ইষ্ট পূজা করব।"

দ্রৌপদীকে খুশী করার জন্য ভীম সকলের নিকট বিদায় লইয়া পদ্ম আনিতে উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। মহাবল ভীম গাছপালা ভাঙ্গিয়া পশুপক্ষী মারিয়া চতুর্দিক লণ্ডভণ্ড করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন—

মহাশব্দে পুরিল সব বন স্থল।
প্রাণভয়ে পশুপক্ষী পলায় সকল ॥

ইহা দেখিয়া ভীমের মনে ধারণা হইল—তাহার মত বলশালী পৃথিবীতে আর কেহ নাই।

যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার পথের মাঝে একটি ছোট্ট বাঁদর শুইয়া আছে। সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন মনে করিয়া ভীম তাহাকে ডিঙ্গাইয়া না গিয়া লেজ ধরিয়া একপাশে সরাইতে চাহিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! মহাবল ভীম এইটুকু বাঁদরকে সরাইতে পারিলেন না! আস্তে আস্তে তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহুদ্বয়ের ও পায়ের পেশী ফুলিয়া উঠিল, ক্রোধে ক্ষোভে চক্ষু

রক্তবর্ণ হইয়া ঠিকরাইয়া বাহির হইতে চাহিল; গায়ে ঘাম দেখা দিল কিন্তু তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। সহসা ভীমের মনে হইল এ তো সামান্য বানর নয়। তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া সবিনয়ে করজোড়ে কহিলেন—"মহাশয়, আপনি কে?"

ভীমের অবস্থা দেখিয়া বানর কহিল—"আমি হনুমান। তোমার মনে বলবীর্যের বড় অহঙ্কার হয়েছিল তাই একটু পরীক্ষা করলাম মাত্র।"

তখন দ্বিতীয় পাণ্ডব তাঁহার চরণে পড়িয়া তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখিতে চাহিলেন—

শুনিয়া হাসিল তবে হনুমান বীর।
দেখিতে দেখিতে হল পূর্বের শরীর ॥
অতি তপ্ত স্বর্ণ জিনি কিবা অঙ্গশোভা।
বালসূর্য সম যেন চমৎকার প্রভা ॥

সেই রূপ দেখিয়া ভীমের গর্ব চূর্ণ হইল। হনুমান তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ভীম গন্ধমাদন পর্বত হইতে সোনার পদ্ম আনিয়া দ্রৌপদীর মনোরঞ্জন করিলেন। অর্জুনও দেবরাজের কাছে বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে গন্ধমাদন পর্বতে ভাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন।

অর্জুন ফিরিয়া আসিলে যুধিষ্ঠির সকলকে লইয়া আবার দ্বৈতবনে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে দুর্যোধন বনবাসী পাণ্ডবদিগকে নিজ ঐশ্বর্য দেখাইবার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া মহা আড়ম্বরে বনবিহার করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধু কর্ণ আর কৌরব মহিলারাও তাঁহার

সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ফল একেবারে উল্টা। ঐ অঞ্চল ছিল গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের রাজ্য। বনের পাশেই রাজার প্রমোদ প্রাসাদ। কুরু সেনারা বাগানের ভিতর ঢুকিয়া—

ফুল ছিঁড়ে ফল খায় করে হুহুঙ্কার।
গাছপালা ভাঙ্গিয়া করয়ে একাকার॥

গন্ধর্ব রাজের প্রহরীরা আসিয়া বাধা দিল। কিন্তু কুরুসেনারা তাহাদের মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল। খবর পাইয়া চিত্রসেন রাগিয়া আগুন। তিনি তখনই অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সামন্ত লইয়া কুরুসেনাদের আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। গন্ধর্বরাজের প্রবল বিক্রমে কুরুসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন গভীর বনে। চিত্রসেন কুরু মহিলাদের সহিত দুর্যোধনকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিলেন। বিপদ দেখিয়া কৌরব মহিলারা পাণ্ডবদের কাছে দূত পাঠাইয়া সাহায্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির আর থাকিতে পারিলেন না। তখনি ভীম ও অর্জুনকে পাঠাইলেন দুর্যোধনকে মুক্ত করিয়া আনিতে।

চিত্রসেনের সহিত অর্জুনের বন্ধুত্ব ছিল। পাণ্ডবদের সহিত দুর্যোধন যে রকম দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কৌরবদের উপর ভারি চটিয়া ছিলেন। কিন্তু অর্জুন শত্রুকে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া তিনি তো অবাক। চিত্রসেন বলিলেন—"এ কি বন্ধু, তুমি এই দুষ্টদের উদ্ধার করতে এলে কেন ?"

অর্জুন বলিলেন—"কি করি বন্ধু, ধর্মরাজের আদেশ তো অবহেলা করতে পারি না। তিনি বলেছেন গন্ধর্বরাজকে বুঝিয়ে

সুঝিয়ে কৌরবদের মুক্ত করে নিয়ে এস। না হলে বংশের মান থাকে না।" যুধিষ্ঠিরের উদারতায় গন্ধর্বরাজ মুগ্ধ হইয়া সকলকে ছাড়িয়া দিলেন।

মুক্তি পাইয়া দুর্যোধন অপমানে লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিলেন না। একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার আর রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কর্ণ ও দুঃশাসন তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া হস্তিনায় লইয়া গেলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া দুর্যোধন একেবারে মনমরা হইয়া রহিলেন। যাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য দিনরাত চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাই কিনা শেষে তাঁহাকে মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিল। এর চেয়ে যে মৃত্যুই ছিল ভাল।

দুর্যোধনের অবস্থা দেখিয়া কর্ণ কহিলেন—"কেন অনর্থক মন খারাপ করছেন, মহারাজ? পাণ্ডবেরা আপনার কি করতে পারে? ওঁরা চারজনে পৃথিবী জয় করেছিলেন, আমি একাই তা করতে পারি। মনের দুর্বলতা দূর করে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করুন। আমি সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে নিয়ে আসছি আপনার কাছে।" দুঃশাসন এবং শকুনিও ইহাতে সায় দিলেন।

যজ্ঞের আয়োজন চলিতে লাগিল। সৈন্য সামন্ত সহ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। বহু রাজা তাঁহার কাছে পরাস্ত হইয়া দুর্যোধনকে কর দিলেন। কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গোল বাধিল যজ্ঞ লইয়া; ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির থাকিতে দুর্যোধন রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন না। ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। অগত্যা উহার বদলে দুর্যোধনকে বিষ্ণুযজ্ঞ করিয়া কোন মতে মুখরক্ষা করিতে হইল। হাজার হাজার

ব্রাহ্মণ আর গরীব দুঃখী পেট ভরিয়া খাবার আর আঁচল ভরিয়া ধন পাইয়া খুশী হইল। কর্ণের বিক্রমে দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হইয়া নূতন উদ্যমে পাণ্ডবদের অনিষ্ট করিবার ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন।

এইভাবে দিন যায়। এই সময় হঠাৎ একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। বহু শিষ্য সহ ঋষি দুর্বাসা হস্তিনায় আসিয়া অতিথি হইলেন। দুর্যোধন নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও সেবা করিলেন। দুর্যোধনের সেবায় খুশী হইয়া দুর্বাসা বলিলেন—"যা চাইবে কুরুরাজ তাহাই তোমাকে দিব। বল কি বর চাও।"

জোড় হাতে দুর্যোধন বলিলেন—"প্রভো! আপনাকে যে খুশী করতে পেরেছি এই আমার পরম সৌভাগ্য; একান্তই যদি অনুগ্রহ করতে চান তবে একদিন রাত্রিকালে দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হলে দ্বৈতবনে গিয়ে পাণ্ডবদের অতিথি হন এই প্রার্থনা করি।" দুর্বাসা তাহাতে রাজী হইয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঋষি দুর্বাসা ছিলেন ভারি উগ্রস্বভাবের; কথায় কথায় অভিশাপ দেওয়া তাঁর অভ্যাস, সকলেই তাঁর ভয়ে কম্পমান। দুর্যোধন জানিতেন সন্ধ্যার সময় সকলের খাওয়া শেষ হইলে দ্রৌপদীর খাওয়া হয়। তাঁহার খাওয়ার পরে সূর্যের দেওয়া পাত্র হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। সেই সময় দুর্বাসা পাণ্ডবদের অতিথি হইলে তাঁহারা ঋষিকে কিছুতেই খাওয়াইতে পারিবেন না। ক্ষুধার জ্বালায় ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদের অভিশাপ দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।

সন্ধ্যার পর দুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য সঙ্গে লইয়া দ্বৈতবনে

পাণ্ডবদের অতিথি হইলেন। এই কিছুক্ষণ আগে দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইয়াছে। আজ আর হাঁড়িতে কিছুই পাইবার উপায় নাই। পাণ্ডবদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখন উপায়! খাবার দিতে না পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। দুর্বাসা আসিয়াই যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—"আমরা ক্ষুধার্ত। অতিথি সেবার আয়োজন কর।" এই বলিয়াই শিষ্যগণ সহ আহ্নিক করিতে নদীর তীরে চলিয়া গেলেন। দ্রৌপদী তখন অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন দ্রৌপদীর সামনে। পাণ্ডবদের যেন দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াই দ্রৌপদীকে বলিলেন—"সখি, ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। কিছু খাবার দাও।"

একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া দ্রৌপদী বলিলেন—"যে ভয়ের জন্য তোমাকে স্মরণ করলাম, তুমিও দেখি সেই ভয় দেখাতে আরম্ভ করলে। এখন তাহলে দাঁড়াই কোথায় বল।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ওসব শুনব পরে—এখন তোমার রান্নার হাঁড়িটি একবার নিয়ে এস ত! দেখি যদি কিছু থাকে।"

দ্রৌপদী শূন্য হাঁড়িটি আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নতমুখে দাঁড়াইলেন। উহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র অন্ন ও শাকের কণা লাগিয়া ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই মুখে দিয়া পেট ভরিয়া জল খাইলেন। তারপর বিরাট ঢেকুর তুলিয়া বলিলেন—"বড় তৃপ্তি পেলাম, এইভাবে সকলেরই তৃপ্তি হোক।"

ইহা বলি বার বার তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেইমত হইল সবাকার॥

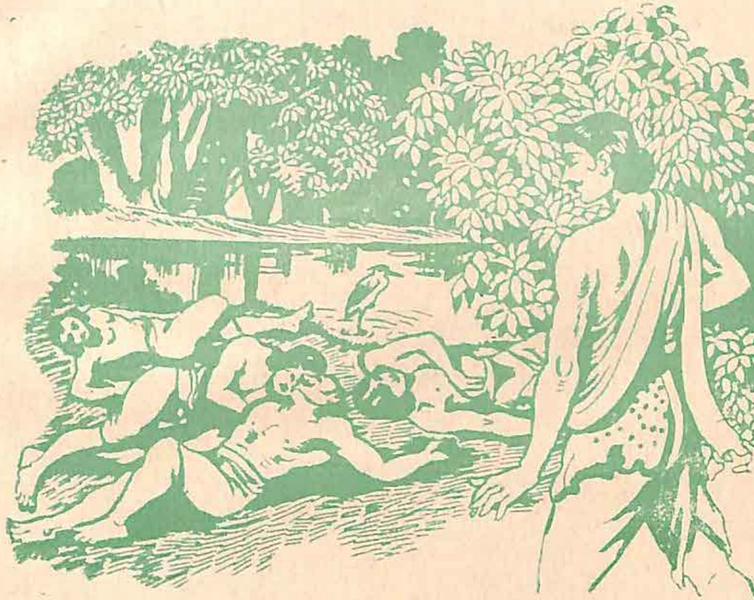
তারপর ভীমকে বলিলেন—"ভীমসেন! তুমি ঋষিদের ডেকে নিয়ে এস।" ভীম তো অবাক! খাবার কোথায় যে ঋষিদের ডাকিয়া আনিবেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীমের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—"তোমার কোন ভাবনা নাই, একবার গিয়ে



দেখই না মজাটা কেমন হয়।" ভীম নদীর ধারে গিয়া ঋষিদের ডাকিতে লাগিলেন। নদীর তীরে বসিয়া ঋষিরা আহ্নিক করিতেছিলেন। হঠাৎ টের পাইলেন যেন তাঁহাদের পেট ভরিয়া গিয়াছে। এক ফোঁটা জলও আর তাঁহাদের খাইবার উপায় নাই। বেগতিক দেখিয়া তাঁহারা চুপে চুপে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। ভীমের ডাকে তাঁহারা কোন সাড়া দিলেন না। এইরূপে বিপদ-বারণ ভগবান ভক্তদের রক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

জলের ধারে একটি বক বসিয়া আছে। সামান্য বক মনে করিয়া তিনি গ্রাহ্যই করিলেন না তার কথা। তরতর করিয়া জলে নামিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু হইল।

নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির একে একে বাকী তিন ভাইকে পাঠাইলেন তাঁহার খোঁজে। কিন্তু সকলেরই এক দশা ঘটিল।



বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও ভাইদের কাহাকেও ফিরিতে না দেখিয়া, যুধিষ্ঠির নিজেই চলিলেন তাঁহাদের খোঁজে। তারপর সরোবরের তীরে ভাইদের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"ধর্মরাজ, তোমার মত জ্ঞানী পুরুষের এই রকম অজ্ঞানের মত কান্নাকাটি করা মোটেই শোভা পায় না। তোমার ভাইরা

এইভাবে দিন যায়। একদিন পাণ্ডবেরা শিকারে গিয়াছেন এমন সময় দুর্যোধনের ভগ্নীপতি জয়দ্রথ সেখানে উপস্থিত। কুটুম্বকে দেখিয়া দ্রৌপদী মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু দুষ্ট জয়দ্রথ হঠাৎ তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। বেগতিক দেখিয়া দ্রৌপদী চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া পাণ্ডবেরা ছুটিয়া আসিলেন। জয়দ্রথ তখন দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া দিয়া ছুট দিলেন বনের ভিতর। কিন্তু ভীম তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া মারের চোটে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। ধর্মরাজের কথায় প্রাণে মারিলেন না।

অপমানে জর্জরিত হইয়া জয়দ্রথ হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং তথায় মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া বর পাইলেন যে একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর চার পাণ্ডবকে তিনি যুদ্ধে হারাইতে পারিবেন।

আর একদিন পাণ্ডবেরা শিকারে বাহির হইয়াছেন হঠাৎ তাঁহাদের ভারি পিপাসা পাইল। একটি গাছের নীচে বসিয়া যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন—"নকুল, যেখান থেকে পার জল নিয়ে এস। আমি তো আর চলতে পারি না।" বনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন নকুল। হঠাৎ সামনে পড়িল একটি পরিষ্কার সরোবর। টলটলে তার ফটিক-জল। নকুল ভাবিলেন, আগে তো নিজে ঠাণ্ডা হইয়া লই, তারপর ভাইদের জন্য জল লইয়া যাইব। এই ভাবিয়া সরোবরে যাইতেই, কে যেন বলিয়া উঠিল—"ওহে নকুল, আগে আমার চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর যত পার জল খাও। না হলে জল ছুঁয়েছ কি মরেছ।" এদিক ওদিক তাকাইয়া নকুল দেখিলেন—কেহ কোথাও নাই

আমার কথা শোনেনি তাই এই দশা হয়েছে। তুমি অনর্থক কান্নাকাটি করলে কি হবে?”

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“তারা কি করেছিল যে এমন সর্বনাশা অবস্থা হল?”

বকরূপী ধর্ম বলিলেন—“আমি তাদের চারটি প্রশ্ন করে বলেছিলাম যে এইগুলির উত্তর দিয়ে যত খুশী জল খাও। নইলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু আমার কথা তো আর শুনলো না, কি করি বল!”

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বেশ তোমার প্রশ্নগুলি বল—দেখি আমি উত্তর দিতে পারি কি না।”

বকরূপী ধর্মরাজ বলিলেন—

কিবা বার্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

প্রশ্ন শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বেশ! তবে শোন—সময় যেন পাচক—সে প্রাণীগণকে দিয়ে ব্যঞ্জন রাঁধছে। এই হল বার্তা!”

“রোজই লোকের মৃত্যু হচ্ছে। যারা বেঁচে আছে তারা একবারও ভাবে না যে তাদেরও মৃত্যু হবে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে!”

“তারপর পথের কথা যদি বল। নানা মুনির নানা মত। অতএব মহাপুরুষেরা যে পথে গেছেন সেই পথই প্রকৃত পথ।”

“শেষ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—যে প্রবাসী নয়, ঋণী নয়—সে দিনান্তে শাক-ভাতও যদি খায় তবু সে সুখী।”

উত্তর শুনিয়া বকরূপী ধর্ম খুব খুশী হইলেন এবং নিজরূপ ধরিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"পুত্র, তোমায় একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। বাস্তবিকই তোমার মত জ্ঞানী পৃথিবীতে দুজন নাই। এইজন্য তোমার ভাইদের মধ্যে একজনকে বাঁচিয়ে দেব। এখন কাকে চাও বল।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"তবে দয়া করে নকুলকে বাঁচিয়ে দিন।"

ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ভীম বা অর্জুনকে না চেয়ে নকুলকে বাঁচাতে চাইলে কেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মাতা কুন্তীর এক পুত্র আমি তো বেঁচে রইলাম—মা মাদ্রীর একটি পুত্র বাঁচুক এজন্যই এরূপ বললাম।"

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে অতিশয় তুষ্ট হইয়া ধর্ম ভীমার্জুন নকুল সহদেব চারি ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন।

তারপর সকলে জলপান করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে বার বৎসর কাটিয়া গেল। বাকী এখন এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। এই এক বৎসর এমন ভাবে লুকাইয়া থাকিতে হইবে যেন দুর্যোধনের গুপ্তচরেরা কিছুতেই টের না পায়। পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী মিলিয়া কোথায় কিভাবে থাকা যায়—তার গভীর পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক আলোচনার পরে স্থির হইল মৎস্যরাজ বিরাটের বাড়ীতেই লুকাইয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থান। একমাত্র সেখানেই নিরাপদে থাকা যাইবে।

পাণ্ডবেরা সঙ্গের লোকজন সকলকে বুঝাইয়া বিদায় দিলেন এবং দুঃস্থ বেশ ও ছদ্ম নাম লইয়া বন হইতে বাহির

হইলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক, সহদেব তন্ত্রীপাল ও দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম গ্রহণ করিয়া বিরাট নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।





বিরাট পর্ব

বন হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডবের ছদ্মবেশে ঘুরিতে ঘুরিতে মৎস্য রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এখন সমস্যা হইল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। এই সব লইয়া তো কোথাও যাওয়া চলে না—কিন্তু রাখা যায় কোথায়? রাজধানীতে যাওয়ার পথে ছোট একটি পাহাড়; সেই পাহাড়ের উপর ছিল এক মস্ত বড় শমী গাছ। স্থির হইল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঐ গাছের উপর রাখিতে হইবে। ভীম তখন করিলেন কি—

বসন আচ্ছাদি সব একত্র ছান্দিয়া।
রাখিলেন উচ্চ তরু শাখাতে বান্ধিয়া॥

তারপর রাজধানী যাওয়ার পথে প্রচার করিয়া দিলেন যে উহা

তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতার মৃতদেহ। বিশেষ কাজে তাঁহারা বিদেশে যাইতেছেন, ফিরিয়া আসিয়া উহার সৎকার করিবেন। ইহার ফল হইবে এই যে, ভূতের ভয়ে কেহ আর ঐদিকে মাড়াইবে না এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলিও চোরের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

এইভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহারা একে একে বিরাট রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট আশ্রয় চাহিলেন। বিরাট রাজা তাঁহাদের এক একটি কাজের ভার দিয়া রাজপুরীতে আশ্রয় দিলেন। কঙ্ক হইলেন রাজার সভাসদ, বল্লভ প্রধান পাচক। আর, স্বর্গে থাকিতে অর্জুন খুব ভাল নাচগান শিখিয়াছিলেন, তাই বৃহন্নলা বেশধারী অর্জুনের উপর রাজকন্যাদের নাচগান শিখাইবার ভার দেওয়া হইল। তখনকার দিনে যাঁহারা নাচগান শিখাইতেন তাঁহারা মাথায় লম্বা বেণী রাখিতেন এবং অনেকটা মেয়েদের মতই পোশাক পরিতেন, তাই অর্জুনকেও তেমনই পোশাক পরিতে হইয়াছিল। তন্ত্রীপাল গোরক্ষক, গ্রন্থিক অশ্বরক্ষক এবং সৈরিন্ধ্রী রাজ অন্তঃপুরে রাণী সুদেষ্ণার সখী হইয়া রহিলেন।

রাজপুরীতে বেশ সুখেই পাণ্ডবদের দিন কাটিতে লাগিল। রাজা বিরাট ভারি মনখোলা লোক, পাশা খেলার ঝোঁকও খুব। কঙ্ক পাশা খেলায় সুদক্ষ জানিয়া তিনি খুব খুশি। সুযোগ পাইলেই রাজা কঙ্কের সহিত দুই এক দান না খেলিয়া ছাড়েন না। বল্লভও রান্নার অবসরে নানাপ্রকারের মল্ল ক্রীড়া দেখাইয়া রাজার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। বৃহন্নলা রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁহার সখীদের নাচ-গান শিক্ষা দেন। মেয়েরা তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করে। তিনিও তাঁহাদের স্নেহ করেন মেয়ের মত। সৈরিন্ধ্রীও রাণী সুদেষ্ণার অন্তরঙ্গ সখীদের মধ্যে স্থান

পাইলেন। তিনি রাণীকে জানাইলেন যে পাঁচজন গন্ধর্ব তাঁহার উপাস্য দেবতা। কাজেই তিনি কখন কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইবেন না বা কাহারও পদ সেবা করিবেন না। ইহাতে অনিয়ম হইলে গন্ধর্বরা বিরক্ত হইয়া বিষম অনর্থ বাধাইবেন। সৈরিন্ধ্রীর কথায় রাজী হইয়া রাণী তাঁহার নিয়ম রক্ষার সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মৎস্য রাজ্যের প্রধান সেনাপতি রাণী সুদেষ্ণার ভাই কীচক ছিল অসাধারণ বলবান, আর নামকরা যোদ্ধা। তাহারই বাহুবলে বিরাট-রাজ নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করিতেন। কীচক তাই কাউকে গ্রাহ্য করিত না; এমন কি রাজাকেও না। সৈরিন্ধ্রীর রূপ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। রাণী ইহাতে অত্যন্ত আপত্তি জানাইলেন। গন্ধর্বের ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন কিন্তু কীচক তাঁহার কথা শুনিল না—জানাইল, বাধা দিলে সে আত্মহত্যা করিবে। ভয়ে সুদেষ্ণা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

তখন কীচককে আর পায় কে! সে একদিন সুযোগ পাইয়া সৈরিন্ধ্রীকে ধরিতে গেল। ভয়ে সৈরিন্ধ্রী রাজসভায় গিয়া রাজার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তাহাতেও কি নিস্তার আছে? দুষ্ট কীচক সেখানেই গিয়া তাঁহার চুলের মুঠি ধরিল এবং তাঁহাকে লাথি মারিতে গিয়া টাল সামলাইতে না পারিয়া নিজেই মাটিতে পড়িয়া গেল। তারপর কোন দিকে না তাকাইয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া সভা কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

চোখের নিমেষে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সভার সকলে

একেবারে স্তব্ধ। রাজা বিরাট কীচককে ভয় করিতেন। এত বড় অন্যায় করিতে দেখিয়াও তিনি তাহাকে কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। সৈরিন্ধ্রী তখন সভায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ভীম লাফাইয়া ওঠেন আর কি! কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ইশারায় থামাইয়া সৈরিন্ধ্রীকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিয়া অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল। খাওয়া দাওয়ার পর রাজপুরীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, দ্রৌপদী চুপে চুপে ভীমের কাছে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভীম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"দেখ, মন খারাপ করলে চলবে না। এখন যেরূপেই হোক দুষ্টকে শেষ করতে হবে। তুমি এক কাজ কর—ওকে কোন মতে একদিন রাত্রে নাচগান শেখার ঘরে নিয়ে এসো, আমি আগেই সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকব। তারপর দেখা যাবে সে কত বড় বীর।"

পরদিন দ্রৌপদী ভীমের কথামত কাজ করিলেন। সুযোগ মত এক সময় কীচককে বলিলেন যে বিবাহে তাঁহার মোটেই অমত নাই—তবে, নিরিবিলি তাহার সঙ্গে কিছু কথা আছে। সে যদি রাত্রে নাচগান শিক্ষার ঘরে যায়, তবেই সব কথার মীমাংসা হইয়া যাইবে। আনন্দে অধীর হইয়া কীচক তখনি তাহাতে রাজী হইল। দ্রৌপদী সব কথা ভীমকে জানাইলেন। ভীমও রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিন গিয়া রাত্রি হইল; রাজপুরীর সকলে নিদ্রায় অচেতন। গভীর রাত্রে কীচক গিয়া প্রবেশ করিল নাচগান শিক্ষার ঘরে। অন্ধকার ঘর, কিছুই দেখা যায় না। কীচক সেখানে আসিয়া সৈরিন্ধ্রীর খোঁজ করিতে লাগিল। আর যায় কোথায়! ঘরের

কোণে লুকাইয়াছিলেন ভীম। অন্ধকারে তিনি বাঘের মত কীচকের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ চলিল হুড়াহুড়ি, তারপর সব চুপ। ভীম তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন এবং—

হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল ॥



কীচককে একতাল মাংস পিণ্ডের মত করিয়া উঠানে ফেলিয়া দিয়া তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে রাজপুরীতে বিষম হুলুস্থূল। গন্ধর্বের হাতে কীচকের মৃত্যু হইয়াছে। ভায়ের শোকে রাণী সুদেষ্ণা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কীচকের আরও একশত ভাই ছিল। তাহারা তো দ্রৌপদীর উপর রাগিয়া আগুন। শত ভাই হুঙ্কার

ছাড়িল ঃ "এরই জন্য যখন কীচকের প্রাণ গেছে তখন একেও মরতে হবে তার সাথে। দুষ্টাকে নিয়ে চল শ্মশানে।" তারপর দ্রৌপদীকে ধরিয়া লইয়া চলিল কীচকের মৃতদেহের সঙ্গে। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন দ্রৌপদী। কান্না শুনিয়া ভীম ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিলেন। রাজপুরীর সামনেই ছিল মস্তবড় একটা বটগাছ। একটানে তাহা উপড়াইয়া লইয়া ভীম কীচকের শত ভাইকে একেবারে পিষিয়া ফেলিলেন। তারপর কেহ কিছু বুঝিবার আগেই দ্রৌপদীকে মুক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতে দ্রৌপদীকে সকলে সমীহ করিয়া চলিতে লাগিল।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার সঙ্গে বিরাট রাজার বিবাদ ছিল বহুকালের। কিন্তু কীচকের বিক্রমে তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। এইবার সুশর্মা সুযোগ পাইয়া মৎস্য দেশ আক্রমণ করিলেন। বিরাট রাজার বহু ভাল ভাল গরু ছিল। সেইগুলি পাইবার জন্য দুর্যোধনও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণও গেলেন তাঁর সঙ্গে। চিরশত্রু সুশর্মা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে শুনিয়া রাজা বিরাট সমস্ত সৈন্য নিয়া তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য চলিয়া গেলেন। এইসময় রাজধানীতে খবর আসিল যে কৌরবেরা উত্তর দিক হইতে রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।

বিরাটরাজের ছেলে উত্তরের উপরে ছিল রাজপুরী রক্ষার ভার। সে মেয়েদের মধ্যে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"কি করি এখন! বাবা সবই নিয়ে গেছেন যুদ্ধে। একজন মাঝারি রকমের সারথিও তিনি রেখে যান নি। কাজ চালাবার মত একটি সারথি পেলেও কৌরবদের টের পাইয়ে দিতাম

মজাটা।" দ্রৌপদী এই কথা অর্জুনকে জানাইয়া বলিলেন, "সম্পূর্ণ এক বছর আছি এখানে—এখন বিপদের সময় এঁদের সাহায্য না করলে মনুষ্যত্ব থাকে না।"

অর্জুন বলিলেন—"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার তো এই অবস্থা। এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি?"

দ্রৌপদী বলিলেন—"এই বেশেই তুমি সারথি হয়ে উত্তরকে নিয়ে যাও না কেন? আমার তো বেশ ধারণা হচ্ছে আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময় পার হয়ে গেছে। দরকার হলে নিজ মূর্তি ধরে অস্ত্রও চালাতে পারবে।"

দ্রৌপদীর কথায় অর্জুন রাজী হইলেন। তখন দ্রৌপদী উত্তরকে গিয়া বলিলেন—"রাজকুমার, তোমাদের বৃহন্নলা কিন্তু খুব ভাল রথ চালাতে পারে। ইচ্ছা হয়ত তাকে নিয়ে যেতে পার যুদ্ধে।"

তাহাই হইল। বৃহন্নলা বেশধারী অর্জুনকে সারথি করিয়া উত্তর গেল কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে। কিন্তু বিশাল কৌরব সৈন্য দেখিয়া তাহার এমন ভয় হইল যে সে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড় দিল রাজধানীর দিকে। ছদ্মবেশী অর্জুন তখন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বুঝাইয়া শান্ত করিয়া তাহাকে সেই শমীগাছের নিচে লইয়া গেলেন। তাঁহার কথায় উত্তর গাছের উপর হইতে অস্ত্রশস্ত্রের আঁটিটি পাড়িয়া আনিল। অর্জুন তাহা হইতে গাণ্ডীব ধনুক ও অক্ষয় তূণ লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাঁহার পরিচয় পাইয়া উত্তরের ভয় দূর হইল। সে নির্ভীক চিত্তে সারথি হইয়া অর্জুনের রথ চালাইতে লাগিল।

ছদ্মবেশী অর্জুন ও রাজকুমার উত্তরের ছোটাছুটি দেখিয়া

কৌরবের মধ্যে হাসির রোল উঠিল। দুইজনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা নানা কথা বলিয়া হাসি ঠাট্টা করিতে লাগিল। এমন সময় গাণ্ডীবের ভীষণ টংকারে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল।



অবাক হইয়া সকলে দেখিল নর্তক বেশধারী এক যোদ্ধা আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খানিকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অর্জুন দেখিলেন অনর্থক রক্তপাত করার দরকার নাই। তখন তিনি সম্মোহন বাণ মারিয়া কৌরবদের অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কৌরবদের পরাস্ত করিয়া অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া গেলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসার পর কৌরবেরাও প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া

গেলেন। উত্তরও তাহাদের গরুগুলি রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিল। এদিকে সুশর্মার সহিত যুদ্ধে বিরাট পরাস্ত ও বন্দী হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্মাকে পরাস্ত করিয়া বিরাটরাজাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। এই সময় খবর রটিয়া গেল যে রাজকুমার উত্তর কৌরবদের তাড়াইয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। শুনিয়া বিরাট আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কঙ্ক শুনেছ, মহাবল কৌরবেরা নাকি উত্তরের হাতে মার খেয়ে পালিয়েছে! আজ বড় আনন্দের দিন। এস, একদান পাশা খেলা যাক।"

পাশার দান সাজাইয়া কঙ্ক বলিলেন—"যেখানে বৃহন্নলা সারথি সেখানে জয় তো হবেই, মহারাজ।" কথাটা রাজার ভাল লাগিল না। তিনি ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া খেলায় বসিয়া গেলেন এবং খেলার মাঝে মাঝে উত্তরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কও বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবার আর বিরাটরাজ থাকিতে পারিলেন না। কৌরব-বিজয়ী পুত্রের সঙ্গে কিনা একজন নর্তকের তুলনা! রাগে আগুন হইয়া রাজা হাতের পাশা ছুঁড়িয়া মারিলেন। পাশার ঘায়ে কঙ্কের ঠোঁট কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন দ্রৌপদী। তাড়াতাড়ি তিনি এক পাত্র জল আনিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ত ধুইয়া দিলেন।

এই সময় দ্বারী আসিয়া সংবাদ দিল যে রাজকুমার উত্তর ও বৃহন্নলা রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। রাজা বলিলেন—"কুমারকে আসতে বল। আমরা তারই জন্য বসে আছি।" দ্বারী চলিয়া যায় দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—"আর শোন, বৃহন্নলাকে বলো যে আমি বলেছি তার এখানে আসার

দরকার নেই।” দ্বারী চলিয়া গেলে যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হইলেন। কারণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা আছে, যেখানে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত হইবে সেখানকার সব কিছুই তিনি ধ্বংস করিয়া ছাড়িবেন। কিছুক্ষণ পর কুমার উত্তর আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। কঙ্কের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—“কী সর্বনাশ, এঁর এ অবস্থা হল কি করে, পিতা ?”

রাজা বলিলেন—“এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলে তুমি, আর কঙ্ক বলে কিনা বৃহন্নলা যেখানে আছে সেখানে জয় তো হবেই। একটা নর্তকের তুলনা করে তোমার সঙ্গে !”

রাজার কথায় উত্তর অনুতাপ করিয়া বলিল—“বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে, পিতা। যুদ্ধ তো আর আমি করিনি—এক দেবকুমার আমার বিপদ দেখে এসে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর সাহায্য না পেলে আজ রাজধানীর একখানি পাথরও থাকত না। অনর্থক আপনি ঐ ব্রাহ্মণকে আঘাত করেছেন। এখনি এঁর কাছে আপনি ক্ষমা চান। না হলে বিষম অনিষ্ট হবে।” পুত্রের কথায় তিনি বুঝিলেন কাজটা অন্যায় হইয়াছে। অনুতপ্ত হইয়া রাজা কঙ্কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরও রাজাকে অভয় দিয়া কহিলেন—“আমি আপনাকে পূর্বেই ক্ষমা করেছি, রাজন্।”

সেইদিন রাত্রেই পাণ্ডবেরা হিসাব করিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসের সময় পার হইয়া আরও কয়েকদিন বেশি হইয়া গিয়াছে। আনন্দে তাঁহারা পরস্পর কোলাকুলি করিলেন। তারপর উত্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে পরদিন ভোরেই তাঁহারা ছদ্মবেশ ছাড়িয়া নিজেদের প্রকাশ

করিবেন। পরদিন সকালে রাজার সহিত কৌতুক করার জন্য যুধিষ্ঠির গিয়া বসিলেন রাজ সিংহাসনে। তাঁহার পাশে বসিলেন দ্রৌপদী। চার ভাইদের মধ্যে কেহ ছত্র, কেহ রাজদণ্ড, অপরে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ধরিলেন। আর উত্তর জোড়হাতে দাঁড়াইল সামনে।

খবর গেল রাজার কাছে। তিনি ছুটিয়া আসিলেন। সবার অবস্থা দেখিয়া রাজা একেবারে চটিয়া লাল। তারপর পুত্রের কাছে পাণ্ডবদের পরিচয় পাইয়া তিনিও একেবারে হতভম্ব। হাঁটু গাড়িয়া রাজা বসিয়া পড়িলেন সিংহাসনের নীচে। অনুতপ্ত কণ্ঠে তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চাহিলেন। যুধিষ্ঠির রাজাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"তোমার এখানে বড়ই সুখে ছিলাম, মহারাজ। মহা ভাগ্য যে আমাদের অজ্ঞাতবাস সার্থক হয়েছে। একসঙ্গে থাকলে অল্পবিস্তর কথা কাটাকাটি হয়, এর জন্য আর ক্ষমা চাওয়ার কি আছে?"

যুধিষ্ঠিরের কাছে অভয় পাইয়া বিরাটরাজা যেন বাঁচিয়া গেলেন। তিনি তখন ধরিয়া পড়িলেন যে তাঁহার মেয়ে উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হউক। জিভ কাটিয়া অর্জুন বলিলেন—"নারায়ণ, নারায়ণ, ও কি কথা বলছেন, মহারাজ! উত্তরা আমার শিষ্যা, মেয়ের মত স্নেহে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছি—অতএব তাঁকে আমার পুত্র অভিমন্যুর সাথে বিবাহ দিলেই শোভন হবে।"

অভিমন্যু যোগ্য পাত্র ইথে নাহি আন।
মমপুত্রে নরপতি কর কন্যা দান॥

তাহাই হইল। সংবাদ গেল দ্বারকায়। যাদবগণ সহ

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে লইয়া বিরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া রাজা দ্রুপদ ও অন্যান্য কুটুম্বেরা আসিলেন। মহা সমারোহে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল।





উদ্যোগ পর্ব

অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহের পর যাদবগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম দেশে চলিয়া গেলেন। অপর সকলে মিলিয়া এক সভা হইল। পাণ্ডবেরা এখন কি করিবেন এই নিয়া সভায় আলোচনা চলিল। বহু আলাপ আলোচনার পর স্থির হইল যে পুরোহিত ধৌম্যকে দুর্যোধনের কাছে পাঠান হউক। যদি তিনি পুরোহিতের কথায় পাণ্ডবদের রাজ্য ছাড়িয়া দেন ভালই —না হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাই হইল। পাণ্ডবদের পক্ষ হইয়া ধৌম্য হস্তিনায় গেলেন। তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবার জন্য বহু সাধ্য সাধনা করিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল। দুর্যোধন বলিলেন যে সূঁচের ডগায় যেটুকু মাটি উঠে, তাহাও তিনি বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদের ছাড়িয়া দিবেন না। ধৌম্য ফিরিয়া আসিলে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ

হইল। পাণ্ডবেরা সাহায্য চাহিয়া দেশে দেশে রাজাদের কাছে দূত পাঠাইলেন। তখনকার নিয়ম ছিল যিনি আগে যাঁহার কাছে সাহায্য চাহিবেন, তিনি তাঁহারই পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিবেন।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য পাইবার জন্য প্রথমেই দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। এদিকে দুর্যোধনও বসিয়া ছিলেন না। ধৌম্য চলিয়া যাইতেই তিনিও চারিদিকে দূত পাঠাইয়া রাজাদের দলে টানিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ রাজারা সৈন্য-সামন্ত সহ হস্তিনায় আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দুর্যোধন করিলেন কী, শ্রীকৃষ্ণকে দলে আনিবার জন্য তিনিও দ্বারকা যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন এই কথা। তিনি এখানে এক খেলা খেলিলেন। তাঁহার শয়ন-ঘরে বিছানার শিয়রের দিকে একখানা সোনার সিংহাসন, পা ধোয়ার জন্য জলপূর্ণ একটি সোনার ঘটি আর একখানা গামছা আনিয়া রাখিলেন। তখন—

এই ভাবে পাদ্যঅর্ঘ সাজায়ে রাখিয়া।
কপট নিদ্রায় হরি রহিলা শুতিয়া॥

দুর্যোধন আসিয়া শুনিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঘরে ঘুমাইয়া আছেন। তিনি তখন কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সোজা একেবারে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন-ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিয়া ভাবিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার পক্ষে আসিবেন। না হইলে এ রকম অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া রাখিতেন না। খুশি মনে দুর্যোধন সেই সিংহাসনে গিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে অর্জুন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের

বিছানায় পায়ের কাছে বসিয়া রহিলেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গার অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং অর্জুনের হঠাৎ এ সময় আসার কারণ জানিতে চাহিলেন। অর্জুন তখন ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে রাজী হইয়া তারপর দুর্যোধনের দিকে চাহিলেন। দুর্যোধনও তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে আসিয়াছেন জানাইলেন। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। আগেই যে তিনি অর্জুনের বরণ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন কি করা যায়! নারায়ণী সেনা নামে শ্রীকৃষ্ণের মহাবল পরাক্রান্ত একদল সৈন্য ছিল। তাহাই তিনি দুর্যোধনকে দিয়া বিদায় করিলেন। তারপর দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরামের সাহায্য চাহিলেন। বলরাম কহিলেন—"আমি এই গৃহ-বিবাদে কোন পক্ষেই থাকিব না।"

দুর্যোধন চলিয়া গেলে পর কৃষ্ণার্জুনে বসিয়া যুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না। অর্জুনের রথে সারথি হইয়া রথ চালাইবেন আর দরকার মত পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবেন। অর্জুন তাহাতেই রাজী হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বিরাটনগরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের উৎসাহ যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। ঘন ঘন মন্ত্রণা সভা বসিতে লাগিল। নিমন্ত্রিত রাজগণ সৈন্য সামন্ত লইয়া বিরাটনগরে আসিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, চেদীরাজা ধৃষ্টকেতু, মগধরাজ জয়সেন, আর যদু বংশের সাত্যকী প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা আসিলেন তাঁহাদের দলবল লইয়া। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচও বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া

পিতাকে সাহায্য করিতে আসিল। সকলের মিলিত সৈন্য সংখ্যা হইল সাত অক্ষৌহিণী। এক এক অক্ষৌহিণীতে থাকে ২১৮৭০টি হাতি, ১১৮৭০টি রথ, ৬৫৬১০টি ঘোড়া আর ১০৯৩৫০ পদাতিক সৈন্য। কী বিরাট ব্যাপার!

এদিকে কৌরব পক্ষে প্রাগজ্যোতিষ-রাজ মহাবল ভগদত্ত, ভুরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য, কৃতবর্মা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ, প্রভৃতি বীরগণ সসৈন্যে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মিলিত সৈন্য সংখ্যা হইল এগার অক্ষৌহিণী। মদ্ররাজ শল্য নকুল ও সহদেবের মামা। তিনি আসিয়াছিলেন পাণ্ডবদের সাহায্য করিবার জন্য। কিন্তু মধ্য-পথে দুর্যোধন তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া দলে টানিয়া লইলেন। দুর্যোধনকে কথা দিয়া শল্য পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মাতুল, যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। এখন একটি প্রার্থনা, যুদ্ধে আপনি কর্ণের সারথি হউন। আর সর্বদা তাহাকে নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা করবেন।" শল্যও তাহাতে রাজী হইয়া হস্তিনায় চলিয়া গেলেন।

সর্বনাশা যুদ্ধের কথায় ধৃতরাষ্ট্রের ভারি ভয় হইল। তিনি মন্ত্রী সঞ্জয়কে পাঠাইলেন পাণ্ডবদের শান্ত করিতে। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি তো সবই জানেন। আমাদের মোটেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা নাই। আমরা মোটে পাঁচখানা গ্রাম চাইছি। এতেও যদি কৌরবেরা রাজী না হয় তবে যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় কি বলুন।"

বিরাটনগর হইতে ফিরিয়া সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন যুধিষ্ঠিরের কথা। ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুর একবাক্যে তাহাতে

সায় দিলেন। অনর্থক বংশনাশের চেয়ে এই প্রস্তাব খুবই ভাল। দুর্যোধনের ইহাতে আর আপত্তি করা উচিত নয়। ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্যোধনকে বলিলেন—যুধিষ্ঠিরের সাধু প্রস্তাবের কথা। কিন্তু দুর্যোধন ইহাতেও রাজী হইলেন না। যুদ্ধসজ্জা পুরাদমে চলিতে লাগিল।

সঞ্জয় চলিয়া গেলে পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ধর্মরাজের প্রস্তাবে যে দুর্যোধন রাজী হবে এ কিন্তু আমার মনে হয় না। তবুও আমি নিজেও না হয় একবার চেষ্টা করে দেখি কিছু করতে পারি কি না।" পাণ্ডবেরাও তাহাতে রাজী হইলেন। তখন—

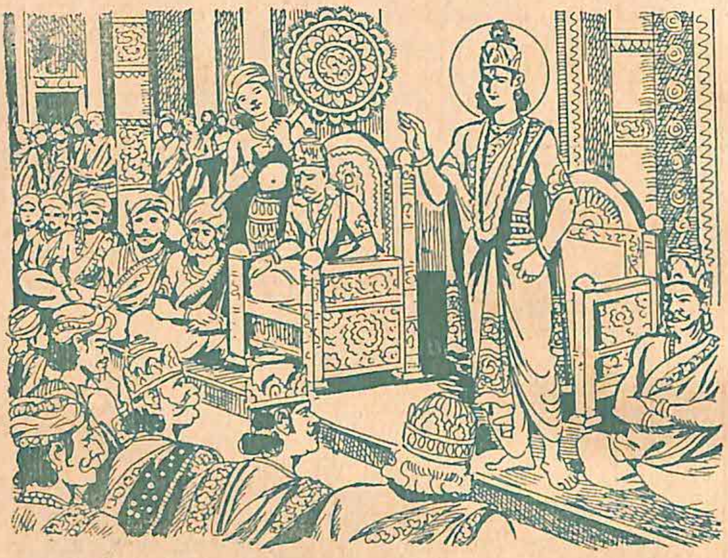
সুসজ্জ হইয়া হরি সাত্যকি সঙ্গেতে করি
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে কেহ অশ্বে কেহ গজে
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ ॥

মহাসমারোহে হস্তিনার লোক শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিল। দেখাদেখি দুর্যোধনও বহু মূল্যবান উপহার দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং রাজপুরীতে থাকিবার অনুরোধ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই সকল উপহার গ্রহণ করিলেন না বা রাজপুরীতে রহিলেন না। সোজা বিদুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া বিদুরের আর আনন্দ ধরে না। পরম ভক্তিভরে বিদুর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেন।

পরদিন পরিপূর্ণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কর্ণের কুবুদ্ধিতে তাঁহারা ইহাতে কিছুতেই কান দিলেন না। বরং শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী

করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তো রাগিয়া আগুন। তাঁহার অগ্নিমূর্তি দেখিয়া কৌরবেরা ভয়ে দমিয়া গেলেন। এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির হাত ধরিয়া সভা হইতে চলিয়া আসিলেন। কুন্তী ছিলেন বিদুরের বাড়ীতে।



ছেলেদের দুঃখের কথা বলিয়া তিনি খুব কান্নাকাটি করিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিরাট নগরে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে শেষ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়াছেন। কৌরবেরা তাঁহার কথা শুনেন নাই। কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য। কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে হইবে দুই পক্ষের ভাগ্য পরীক্ষা। দুই দিকে দুই পক্ষের শিবির স্থাপিত হইল। পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সেনাপতি ভীম, আর কৌরব পক্ষের প্রধান সেনাপতি হইলেন ভীষ্ম। দুই পক্ষের সৈন্য সংখ্যা দেখিয়া দুর্যোধন

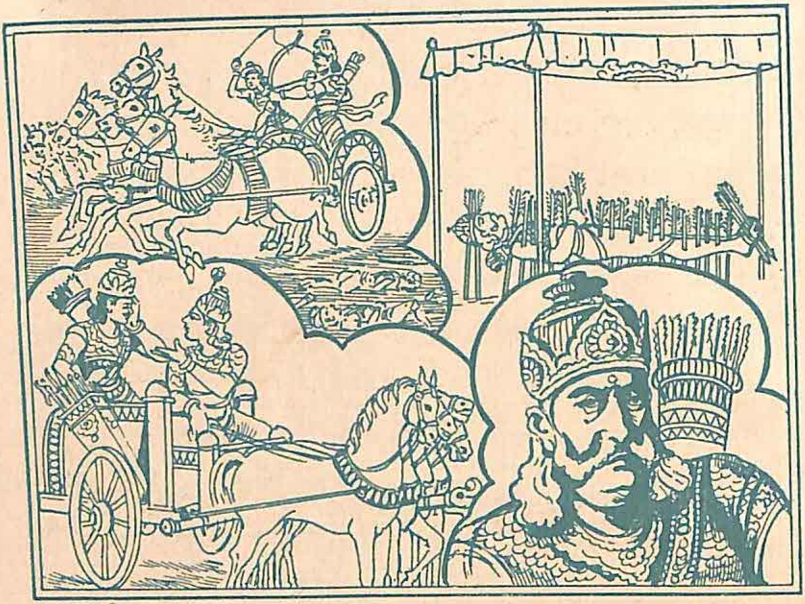
তাঁহার পক্ষের বীরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে কতদিনে এই সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিতে পারিবে। কেউ বলিলেন এক মাসে, কেউ দুই মাসে, কেউ দশদিনে এই সৈন্য ধ্বংস করিতে পারিবেন বলিলেন। কর্ণ আস্ফালন করিয়া কহিলেন তিনি একদিনেই পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন। ভীষ্ম কর্ণের অযথা দর্পের প্রতিবাদ করিলেন। এই উপলক্ষে উভয়ের একদফা ঝগড়া হইয়া গেল। কর্ণ রাগিয়া বলিলেন—"ভীষ্ম যতদিন সেনাপতি থাকবেন ততদিন আমি অস্ত্র ধরব না।"

অপরদিকে যুধিষ্ঠিরও অর্জুনকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জুন বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ সহায় থাকিলে তিনি চোখের পলকে সমস্ত কৌরব সৈন্য ধ্বংস করিতে পারিবেন।

তখন দুই পক্ষই শিবির হইতে বাহির হইয়া সৈন্য সজ্জা করিতে লাগিলেন। ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল রণবাদ্য। আর সঙ্গে সঙ্গে—

দুই দলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশদিক জুড়ি শব্দ হইল অতুল॥

দুই পক্ষই নিয়ম করিলেন যে সমানে সমানে যুদ্ধ করিতে হইবে। পলায়নকারী, অস্ত্রহীন, শরণাগত ও যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইভাবে নিয়ম করিয়া কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।



ভীষ্ম পর্ব

যুদ্ধের সময় সুশৃঙ্খল ভাবে সৈন্য সাজানোর নাম ব্যূহ রচনা। সে যুগে নানা প্রকারের ব্যূহ হইত, যথা—'চক্রব্যূহ' 'গরুড় ব্যূহ'। কৌরব ও পাণ্ডবেরা নিজ নিজ ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অর্জুনের কথা মত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ দুই পক্ষের মাঝখানে লইয়া গেলে অর্জুন দেখিলেন যে, গুরুজন, শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র, পরম আত্মীয়গণ সব যুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া তিনি অন্তরে নিদারুণ ব্যথা পাইলেন। এই সব পরম আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া রাজ্যলাভের কি সার্থকতা আছে তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। এর চেয়ে বরং পুনরায় বনে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল; এই বিবেচনা করিয়া মলিন মুখে ধনুর্বাণ ফেলিয়া দিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বহু উপদেশ

ও যুক্তি দিয়া অর্জুনের বৃথা মোহ দূরীভূত করিয়া শান্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ বাণীই হইল 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা'।

এই সময় যুধিষ্ঠির করিলেন কি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একা পায়ে হাঁটিয়া কৌরবদের কাছে গেলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ লইয়া আসিলেন।

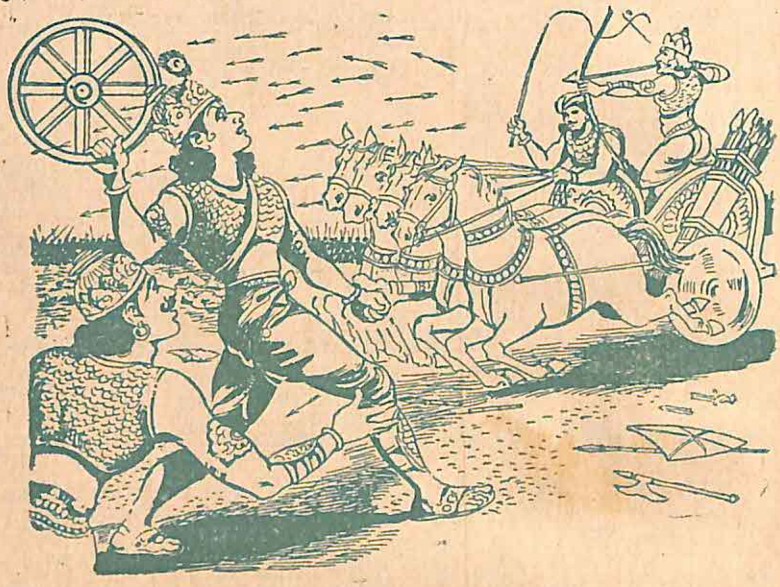
তারপর আরম্ভ হইল যুদ্ধ। প্রথম দিনে কৌরবেরা ভীষ্মকে এবং পাণ্ডবেরা ভীমকে আগে রাখিয়া যুদ্ধে নামিলেন। দুই পক্ষে দারুণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিক্রমে স্বয়ং ভীষ্ম পর্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। শল্যের সহিত যুদ্ধে বিরাটের পুত্র উত্তর নিহত হইল। হতাহতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। রক্তের ঢেউ খেলিতে লাগিল চারিদিকে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুই পক্ষই তখন যুদ্ধ বন্ধ করিয়া যে যাহার শিবিরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দিনে অর্জুন ও ভীষ্মের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার। আহতদের কাতর চীৎকার আর যোদ্ধাদের রণ হুঙ্কারে চারিদিক মুখরিত। এই সময় ভীমসেন ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া কৌরবদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মস্তবড় লোহার গদা হাতে ভীম—

আথালি পাথালি মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
হাতি, ঘোড়া, রথ রথী যায় গড়াগড়ি॥

ভীমের সঙ্গে সঙ্গেই আসিলেন অভিমন্যু। তাহার বাণের মুখে যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। অর্জুন, ভীম আর অভিমন্যুর আক্রমণে কৌরবসেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া

পলাইতে লাগিল। বহু চেষ্টা করিয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ তাহাদের ফিরাইতে পারিলেন না। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আবার যে যাহার শিবিরে চলিয়া গেলেন।

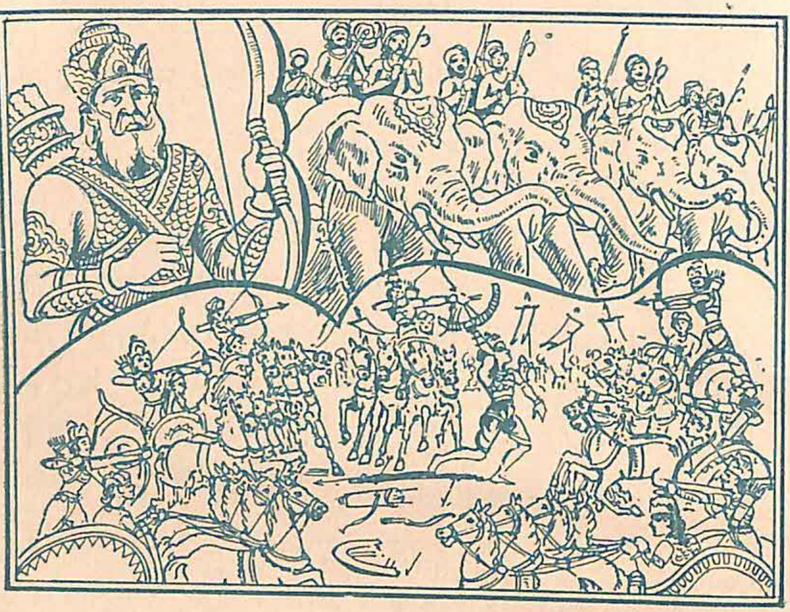


ভীষ্ম সব সমেত দশদিন যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে বহু ঘটনা ঘটিয়া গেল। ভীমের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের সাত ছেলে মারা গেল। আর ঘটোৎকচ কৌরবদের বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না—কিন্তু তাঁহাকেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। অষ্টম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম অর্জুনকে এমন জোরে আক্রমণ করিলেন যে অর্জুন কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া চক্র হাতে ভীষ্মের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন তখন গিয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া ফিরাইয়া আনিলেন।

দশম দিনে অর্জুন করিলেন কি, দ্রুপদের নপুংসক পুত্র শিখণ্ডীকে রথে বসাইয়া যুদ্ধে আসিলেন।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর ॥

অমঙ্গলের মূর্তি নপুংসক শিখণ্ডীকে দেখিয়াই ভীষ্ম ধনুর্বাণ ফেলিয়া দিলেন এবং চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে প্রথমে শিখণ্ডী, পরে অর্জুন বাণের পর বাণ মারিয়া ভীষ্মকে বিঁধিয়া ফেলিলেন। বাণবিদ্ধ ভীষ্ম রথ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ মাটি স্পর্শ করিল না, বাণের উপরেই রহিয়া গেল। ইহাই ভীষ্মের শরশয্যা। কৌরবেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। এইরূপে প্রথম দশ দিনের যুদ্ধ শেষ হইল। ইচ্ছা-মৃত্যু বলিয়া ভীষ্মের তখন মৃত্যু হইল না। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের একপাশে সুরক্ষিত শিবিরে রাখিয়া দেওয়া হইল। রাত্রিবেলা উভয় পক্ষের সকলে ভীষ্মকে দেখিতে আসিলে তিনি দুর্যোধনকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা করিতে বলিলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাহাতে রাজী হইলেন না। অগত্যা ভীষ্ম চুপ করিয়া ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন।



দ্রোণ পর্ব

ভীষ্মের পর দ্রোণ সেনাপতি হইয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দুই পক্ষে অসংখ্য লোক নিহত হইতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার উঠিল। কিন্তু কৌরবদের সুবিধা হইল না। সারাদিন যুদ্ধের পর তাঁহারা পরাস্ত হইয়া শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। ভারী চিন্তায় পড়িলেন দুর্যোধন। সেই রাত্রেই তিনি দ্রোণকে বলিলেন যে যেমন করিয়াই হউক যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে হইবে। তাঁহাকে একবার আটকাইতে পারিলে সহজেই গোল মিটিয়া যাইবে। দ্রোণ বলিলেন—"তা সত্যি—কিন্তু অর্জুন এদিকে থাকতে যুধিষ্ঠিরকে ধরে কার সাধ্য। ওঁকে এখান থেকে অন্যদিকে সরাতে পারলে হয়।" তারপর স্থির হইল যে সংশপ্তক নামে একদল প্রবল যোদ্ধা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে লইয়া যাইবে। এই অবসরে যুধিষ্ঠিরকে

বন্দী করা মোটেই কঠিন হইবে না।

তাহাই হইল। পরদিন সংশপ্তক বাহিনী অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে লইয়া গিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু সুবিধা করিতে পারিল না। অর্জুন তাহাদের পরাস্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে আসিলেন। কৌরবদের ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না ; পরাস্ত হইয়া শিবিরে ফিরিয়া গেল। এইরূপে পর পর দুইদিন চেষ্টা করিয়াও দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে পারিলেন না। বরং ত্রিগর্তরাজ প্রভৃতি কৌরবপক্ষের বড় বড় বীর যোদ্ধা প্রাণ দিলেন।

দুই দুইবার বিফল মনোরথ হইয়া দ্রোণের রোখ চাপিয়া গেল। তিনি এইবার বিষম চক্রব্যূহ তৈয়ার করিয়া যুদ্ধে নামিলেন। এদিকে সংশপ্তকরা আসিয়া অর্জুনকে লইয়া গেল অন্যদিকে এবং এমন যুদ্ধ করিতে লাগিল যে তিনি কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে আসিতে পারিলেন না। দ্রোণের আক্রমণে পাণ্ডবেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বড় বড় যোদ্ধারা প্রমাদ গণিলেন। যুধিষ্ঠির তখন অভিমন্যুকে পাঠাইলেন চক্রব্যূহ ভেদ করিতে। কারণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, প্রদ্যুম্ন আর অভিমন্যু ব্যতীত আর কেহই এই ব্যূহ ভেদের রহস্য জানেন না। স্থির হইল ব্যূহ ভেদ হইলেই ভীম প্রভৃতি অভিমন্যুর পিছন পিছন ব্যূহের ভিতর ঢুকিয়া তাহা চুরমার করিয়া দিবেন।

আদেশ পাইয়া অভিমন্যু প্রচণ্ডবেগে চক্রব্যূহের উপর গিয়া পড়িলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ, দ্রোণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সাতজন যোদ্ধা ব্যূহের সাত জায়গায় থাকিয়া তাহা রক্ষা করিতেছিলেন। অভিমন্যু কর্ণকে পরাস্ত করিয়া ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ভীম প্রভৃতিও তাঁহার পিছন

পিছন আসিতেছিলেন কিন্তু শিব-বরে বলীয়ান জয়দ্রথ তাঁহাদের আটকাইলেন। জয়দ্রথকে পরাস্ত করিয়া কেহই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

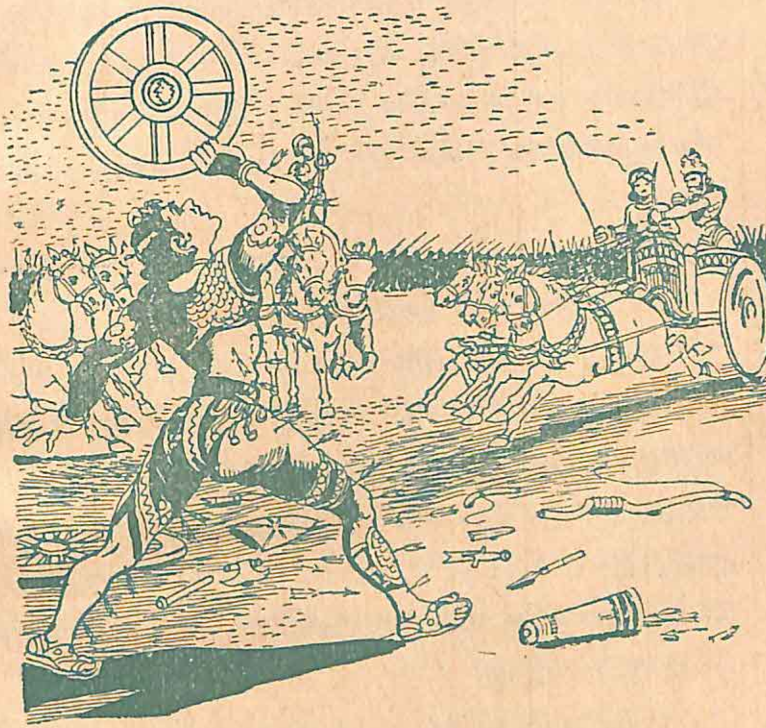
ভিতরে ঢুকিয়া অভিমন্যু ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাণ বর্ষণে দলে দলে কৌরব সেনা মরিতে লাগিল। ষোল বছরের বালক আজ যেন কালান্তক যম হইয়া উঠিয়াছেন—

বাণে বাণে দশদিক অন্ধকারময়।
সপ্তরথী শতবার মানিল পরাজয়॥

সাত সাতজন মহাবীর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অভিমন্যুকে কাতর করিতে পারিলেন না। কৌরব সৈন্যের মৃতদেহে চারিদিকে পাহাড় হইয়া উঠিল।

দ্রোণ দেখিলেন বালক ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। একে একে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, হার্দিক্য তাঁহার কাছে নাকাল হইয়াছেন। যে-কোন প্রকারেই হউক উহাকে বধ না করিতে পারিলে আর উপায় নাই। তাঁহার হাতে ধনুক থাকা পর্যন্ত কেহই তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। তখন শকুনির পরামর্শে স্থির হইল যে সপ্তরথী একত্রিত হইয়া একযোগে তাঁহাকে আঘাত করিবে। কর্ণ প্রথমেই তাঁহার ধনুক কাটিলেন, তারপর ভোজ ঘোড়া, কৃপ সারথিকে কাটিলেন। অভিমন্যু তখন রথের চাকা লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৌরব অধিনায়কেরা তাহাও কাটিয়া ফেলিলেন। তখন অভিমন্যু খালি হাতেই কৌরবদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার কিল চড় লাথির চোটেও বহু মারা পড়িল। শত্রুর বাণে অভিমন্যুর শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তস্রোত

বহিল। অভিমন্যু এখন দুর্বল হইয়াছেন মনে করিয়া দুঃশাসনের পুত্র দুষণ পিছন হইতে তাহার মাথায় প্রচণ্ড গদার আঘাত করিল। অভিমন্যু অতর্কিত আঘাতে মাটিতে পড়িয়া



গেলেন, আর উঠিবার শক্তি রহিল না। এইভাবে অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিয়া কৌরবেরা জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে পাণ্ডব শিবিরে হাহাকার উঠিল। যুধিষ্ঠির, ভীম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ রথ লইয়া শিবিরে আসিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া অর্জুন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর জ্ঞান হইলে শুনিলেন যে জয়দ্রথের জন্য ভীম অভিমন্যুর সঙ্গে

যাইতে পারেন নাই এবং অন্যায় যুদ্ধ না করিলে বালকের এইভাবে প্রাণ যাইত না। রাগে দুঃখে অর্জুনের শরীর জ্বলিয়া গেল। সিংহের মত গর্জিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আগামী কাল সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করিবেন; না হইলে আগুনে পুড়িয়া মরিবেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীষণ জোরে রণশঙ্খ বাজাইয়া দিলেন। ভীমসেন ভৈরব হুঙ্কারে লাফাইয়া উঠিলেন। ঘোর রবে ঢাক ঢোল ও রণশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।—

মহা কোলাহল শব্দ হইল গর্জন।
শুনিয়া হইল ত্রস্ত কুরু সেনাগণ॥

হঠাৎ রাত্রিকালে পাণ্ডব শিবিরে এত হৈ চৈ কোলাহল কেন জানিবার জন্য দুর্যোধন গুপ্তচর পাঠাইলেন। গুপ্তচর আসিয়া অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা বলিলে, ভয়ে জয়দ্রথের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি পলাইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কৌরবেরা বলিলেন যে পলাইবার দরকার নাই। তাহারাই তাঁহাকে নিরাপদে লুকাইয়া রাখিবেন এবং তাহা হইলেই অর্জুন পুড়িয়া মরিবেন।

পরদিন যথাকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুত্রশোকে অর্জুন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যে তাঁহার সামনে আসিল তাঁহাকেই তিনি চুরমার করিয়া জয়দ্রথের খোঁজে ছুটিয়া চলিলেন। কৌরব পক্ষের বড় বড় যোদ্ধারা বিষম বিব্রত হইয়া পালাইতে লাগিলেন। কিন্তু জয়দ্রথ কোথায়? কৌরবেরা তাঁহাকে এমনভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছে যে কিছুতেই তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ মায়ার আশ্রয় নিলেন। হঠাৎ সকলে দেখিল সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। অমনি যুদ্ধ বন্ধ হইয়া

গেল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা সাজান হইল।

অর্জুন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। ইহা দেখিয়া কৌরবদের আনন্দ আর ধরে না। সকলে মিলিয়া চিতার চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। আজ তাঁহাদের প্রধান শত্রু নিপাত হইবে। সেই জন্য আনন্দে অধীর হইয়া জয়দ্রথ বূ্যহের ভিতর হইতে বাহির হইলেন। তারপর কৌরবদের পাশে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ সামনে আসিতেই শ্রীকৃষ্ণ চিতায় আগুন দিতে বলিলেন। তারপর অর্জুনকে বলিলেন—"তুমি বীর। ধনুর্বাণ হাতে লইয়া বীরের মত প্রাণত্যাগ কর।" দাউ দাউ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জুন ধনুর্বাণ হাতে লইলেন। চিতা প্রদক্ষিণ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ চুপে চুপে কহিলেন —"এক বাণে জয়দ্রথের মাথা কাটিবে, আর তাহা মাটিতে পড়ার আগেই অন্য বাণে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে তাঁর বাবার হাতে। বৃদ্ধ সিন্ধুরাজ সমন্ত-পঞ্চক তীর্থে তপস্যা করছেন। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর।" শ্রীকৃষ্ণ মায়াজাল সরাইলেন। অবাক হইয়া সকলে দেখিল। কোথায় সন্ধ্যা! বেলা যে এখন মোটে দুই প্রহর। ভয়ে জয়দ্রথ পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁহার মাথা কাটিয়া উড়াইয়া নিয়া একেবারে তাঁহার পিতার হাতে ফেলিলেন। বৃদ্ধ সিন্ধুরাজ চোখ মুদিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। হঠাৎ হাতে ভারী জিনিস পড়িতেই তিনি তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাথাও ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। দেবতার বর ছিল জয়দ্রথের মাথা যে মাটিতে ফেলিবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথাও

ছিঁড়িয়া পড়িবে। জয়দ্রথ বধ হইলে পাণ্ডবেরা জয়শঙ্খ বাজাইয়া আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সেইদিন আর যুদ্ধ বন্ধ হইল না। হাজার হাজার মশাল জ্বালাইয়া রাত্রেও যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধে অর্জুনের হাতে ভগদত্ত প্রভৃতি কৌরব পক্ষের বড় বড় যোদ্ধা আর ভীমের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের অনেকগুলি পুত্র মারা গেল।

ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ এই সময় আসিয়া কৌরবদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রাত্রে রাক্ষসদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঘটোৎকচের মা ছিল হিড়িম্বা রাক্ষসী, তাই রাত্রে তাহার শক্তি বাড়িয়া গেল অসম্ভব রকম। ঘটোৎকচের আক্রমণে কৌরব সৈন্য মরিয়া শেষ হইতে লাগিল। রাক্ষস অলম্বুস আসিয়াছিল কৌরবদের সাহায্য করিতে। কিন্তু ঘটোৎকচের হাতে তাহার মৃত্যু হইল।

ঘটোৎকচের আক্রমণে কৌরব সৈন্য ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। ইহা দেখিয়া কর্ণ ছুটিয়া আসিলেন। কর্ণকে সামনে পাইয়া ঘটোৎকচ তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুইজনে লাগিয়া গেল তুমুল যুদ্ধ।—

মহাবীর ঘটোৎকচ মায়ার আধার।
মায়াযুদ্ধে কুরুসৈন্য করে ছারখার॥

কর্ণ মহা ভাবনায় পড়িলেন। কিছুতেই কিছু করিতে পারিতেছেন না। এই দেখেন ঘটোৎকচ সামনেই যুদ্ধ করিতেছে, আবার দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে পড়িতে থাকে অজস্র গাছ, পাথর, শেল, শূল, ইত্যাদি। কর্ণও কম যায় না। তিনি বাণের পর বাণ মারিয়া রাক্ষসের মায়া চূর্ণ করিয়া দেন। তবুও কিছুতেই তাহাকে দমন করিতে পারেন

না। এদিকে কৌরব সৈন্যের যায় যায় অবস্থা। শল্যরাজা যুদ্ধ করিতে ছিলেন কর্ণের অতি নিকটে। তিনি বলিলেন—"কর্ণ, তোমার কাছে শুনেছি ইন্দ্রের দেওয়া একাঘ্নি অস্ত্র আছে। সেই অস্ত্রে তুমি রাক্ষসকে বধ কর না কেন ?"

কর্ণ বলিলেন—"তা কি করে হয় ? ঐ অস্ত্র আমি অর্জুনকে বধ করার জন্য তুলে রেখেছি। রাক্ষসের উপরে মারব কি করে ?"

একটু হাসিয়া শল্য বলিলেন—"আগে ঘটোৎকচের হাত থেকে ত বাঁচ। তারপর অর্জুনের কথা কাল ভাবিও।"

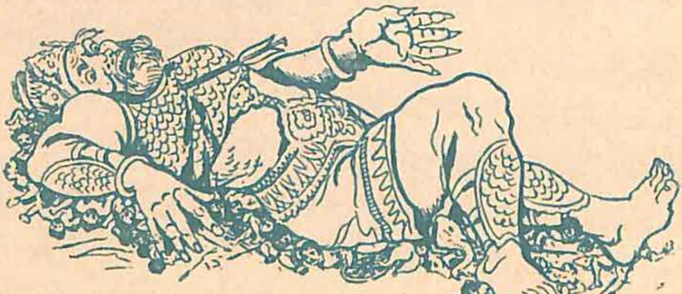
এই সময় ঘটোৎকচ সংহার মূর্তি ধরিয়া কৌরবদের যেন পিষিয়া মারিতে লাগিল। ভয়ে অস্থির হইয়া তাহারা যে যেদিকে পারে পালাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ণ শেষে সেই একাঘ্নি অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। একাঘ্নি অস্ত্র ঘটোৎকচের বুকে বিঁধিয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গেল। আহত রাক্ষস মায়াবলে দেহকে বাড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কুরুকুল চাপিয়া পড়িল। তাহার বিশাল দেহের চাপে হাজার হাজার হাতী, ঘোড়া, রথ, রথী, কুরুসৈন্য পিষিয়া চেপ্টা হইয়া গেল। যুদ্ধ জয় করিয়া কর্ণ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

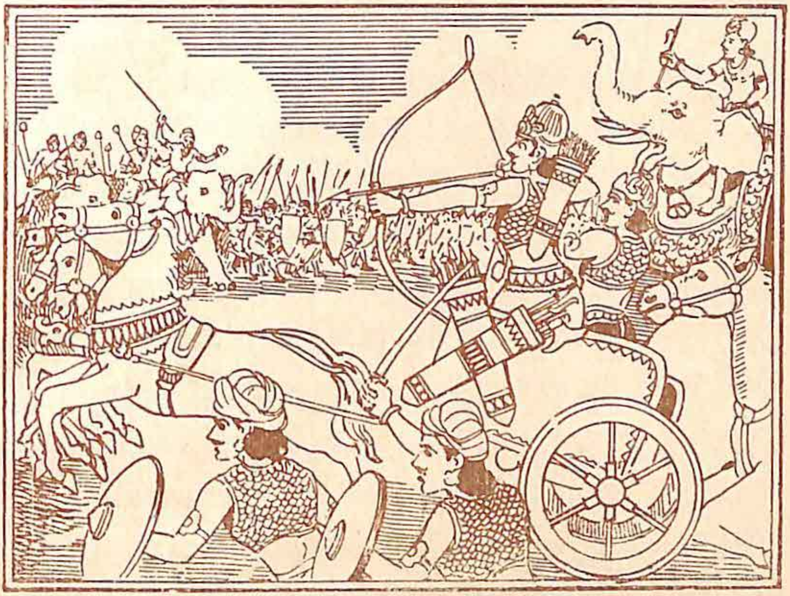
ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডব শিবিরে হাহাকার উঠিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুত্রশোকে ভীম আজ সংহার মূর্তি ধরিয়াছেন। তাঁহার হাতে হাজার হাজার কুরুসৈন্য ও ধৃতরাষ্ট্রের আরও কতকগুলি পুত্র মারা গেল। অর্জুনের হাতেও বহু বীর হতাহত হইল। অবস্থা দেখিয়া দ্রোণ বিচলিত হইলেন। বাণে বাণে চারিদিক অন্ধকার করিয়া তিনি পাণ্ডব

সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আকাশ হইতে ঋষিরা বলিলেন—"দ্রোণ, তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে অনার্যের মত কাজ করছ। তোমার আর বেঁচে লাভ কি? এখনি দেহ ত্যাগ কর।" এই সময় ভীমও দ্রোণের রথ ধরিয়া কহিলেন—"গুরুদেব, অন্যায়ের পক্ষ নিয়া অনর্থক এত প্রাণী হত্যা করছেন। এখন দেহ ত্যাগ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।" কথাগুলি দ্রোণের প্রাণে লাগিল। তিনি তখনি—

যোগাসনে বসিলেন ফেলি ধনুর্বাণ।
কৃষ্ণনাম জপ করি ত্যজিলেন প্রাণ॥

এই সময় দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ছুটিয়া আসিয়া সেই মৃতদেহের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পাঁচদিন যুদ্ধ করিয়া দ্রোণ দেহত্যাগ করিলেন।





কর্ণ পর্ব

দ্রোণের মৃত্যুতে দুর্যোধন একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন কর্ণ আসিয়া বলিলেন—"মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন কেন মহারাজ? ওসব বুড়ো মানুষের কাজ কি যুদ্ধ জয় করা! এবার আমার উপর যুদ্ধের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।" কর্ণের কথায় দুর্যোধন আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং পুরাদমে যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কর্ণ সেনাপতি হইয়াই বলিলেন, "রাজা শল্য আমার সারথি হউন।" প্রস্তাব শুনিয়া শল্য ত চটিয়া লাল! "কী! আমি কর্ণের সারথি হইব? আমি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিলাম।" তখন দুর্যোধন দেখেন মহা বিপদ, তিনি শল্যকে নানা ভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। পরে শল্যও ভাবিয়া দেখিলেন যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে কর্ণের সারথি হইবেন বলিয়া কথা

দিয়াছেন। অগত্যা এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন।

পরদিন কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিরূপে অবতীর্ণ হইলেন। দুইদলে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বাণে বাণে চারিদিক অন্ধকার করিয়া কর্ণ অর্জুনকে খুঁজিতে লাগিলেন। অর্জুন তখন যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে ছিলেন। তাই সামনে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল। সেইদিন ভীমের হাতে দুঃশাসন সহ ধৃতরাষ্ট্রের আরও দশ পুত্রের মৃত্যু হইল।

দুঃশাসনকে বধ করিয়া ভীম তাহার রক্তপান করিলেন। রক্তমাখা হাতে শিবিরে গিয়া দ্রৌপদীর এলোচুল বাঁধিয়া দিলেন। কৌরব সভায় দুঃশাসনের হাতে অপমানিতা হইয়া দ্রৌপদী চুল বাঁধা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল ভীম যেদিন দুঃশাসনের রক্তমাখা হাতে তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিবেন সেইদিন হইতে তিনি আবার চুল বাঁধিবেন। না হইলে উহা খোলাই থাকিবে। ভীমের ভয়ঙ্কর আচরণে কৌরবেরা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। কর্ণও একেবারে স্তম্ভিত। ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"দুষ্ট ভীম আমাকে নির্বংশ না করে ছাড়বে না দেখছি।"

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার জন্য তাঁহার দিকে ছুটিয়া গেলেন। দুইজনে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কর্ণের বিক্রমে যুধিষ্ঠির কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় শল্য কর্ণকে বলিলেন—"যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? এদিকে দুর্যোধন যে ভীমের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে, তাকে রক্ষা কর। তারপর অর্জুনকে মেরে চরম জয়লাভ সহজ হবে।"

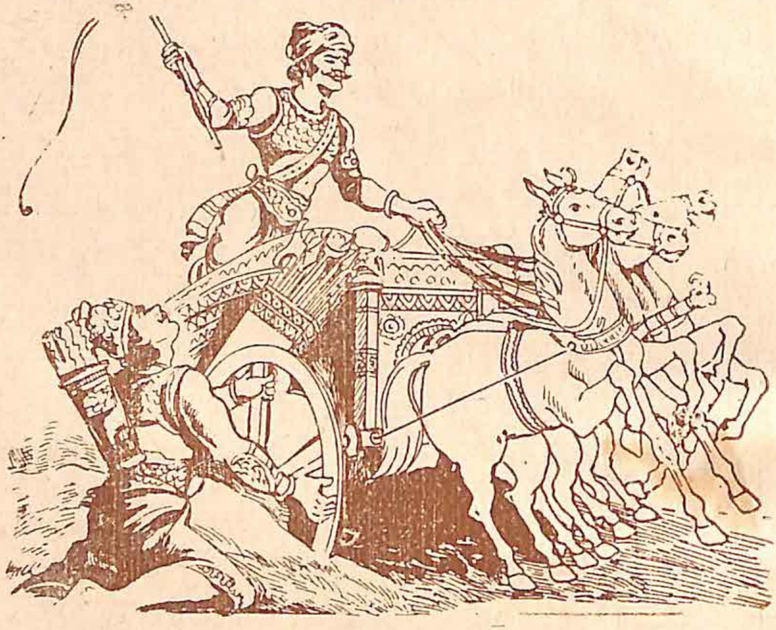
কর্ণ তাড়াতাড়ি দুর্যোধনের রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেই নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে লইয়া শিবিরে গেলেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ছুটিয়া শিবিরে গিয়া দেখিলেন যুধিষ্ঠির কাতর হইয়া শুইয়া আছেন। অর্জুন অগ্রজের অবস্থা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"হয় আজ আমি কর্ণকে মারিব নয়ত নিজেই তার হাতে প্রাণ দিব।"

কর্ণার্জুনে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কেহ কাহাকেও হারাইতে পারিতেছেন না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও ঘোরতর হইয়া উঠিল। কর্ণের পুত্র বৃষসেন মারা গেল অর্জুনের হাতে। পুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণ অর্জুনের উপর বড় বড় মহা অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। অর্জুন বরং আরও জোরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। আর কর্ণও হাঁপাইয়া উঠিলেন। সময় বুঝিয়া শল্যও অর্জুনের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে লাগিলেন।

পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া কর্ণ অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরাম যখন জানিলেন যে কর্ণ ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রিয়, তখন রাগিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন—'মৃত্যুকালে তুই আমার শেখান অস্ত্রের কথা সব ভুলে যাবি, আর তোর রথের চাকা মাটিতে বসে যাবে।'

যুদ্ধ চলিতেছে—হঠাৎ কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গেল। রথ আর চলে না। কর্ণ তখন রথ হইতে নামিয়া অর্জুনকে বলিলেন—"অর্জুন, একটু অপেক্ষা কর, আমি রথের চাকাটি তুলে নিই।" তিনি নিজেই চাকা টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"শাস্ত্রে আছে, বিপদগ্রস্ত শত্রুকে রক্ষা করা ধার্মিকের কর্তব্য।" কর্ণ এই কথা অর্জুনকে বলাতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"ভাল, সুতপুত্র কর্ণ, এখন তোমার ধর্মের কথা মনে হয়েছে!

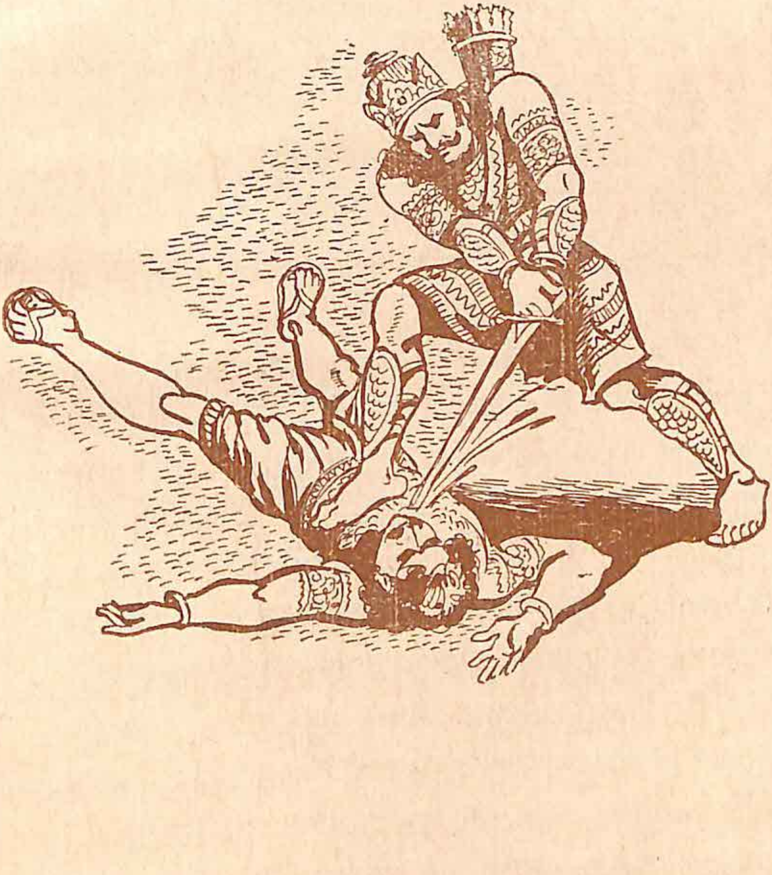


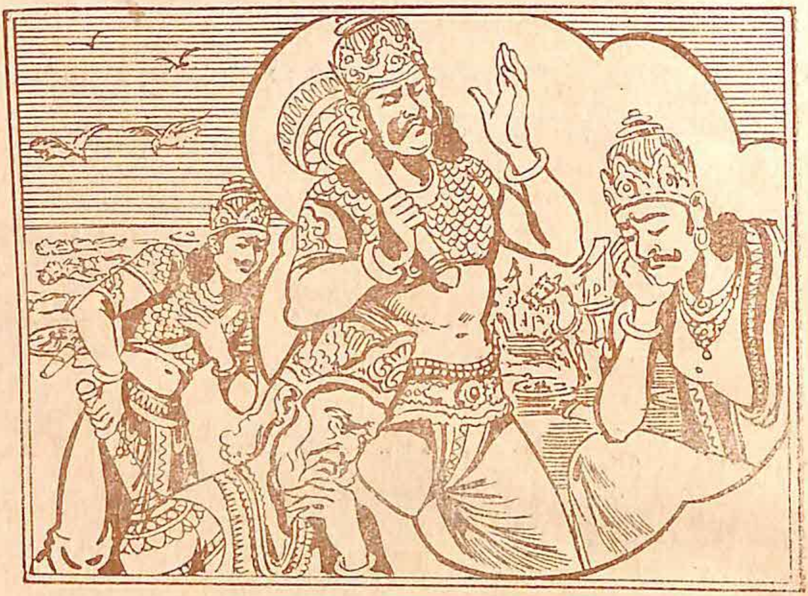
যখন বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী একত্র হয়ে হত্যা করেছিলে তখন এ সকল সুযুক্তিগুলি কোথায় ছিল?"

এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অর্জুন 'অঞ্জলীক' নামে মহা অস্ত্রে কর্ণের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এইভাবে তিন দিন যুদ্ধ করিয়া—

সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ গগন লোহিত বর্ণ
সর্বলোকে চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগনোপরে প্রবেশিল দিনকরে
কর্ণের যতেক তেজোশ্চয়॥

সূর্যের বরেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সূর্যলোকে চলিয়া গেলেন।





শল্য পর্ব

কর্ণের মৃত্যুতে দুর্যোধনের সব আশা ভরসাই একরকম লোপ পাইল। কিন্তু তবুও তিনি হাল ছাড়িলেন না। শল্যকে সেনাপতি করিয়া পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শল্য গদা হাতে ভীমকে আক্রমণ করিলেন। মামা-ভাগ্নেতে লাগিয়া গেল তুমুল যুদ্ধ, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের গদার আঘাতে শল্য অচেতন হইয়া পড়িলেন। বিপদ বুঝিয়া সারথি রথ লইয়া চলিয়া গেল।

চেতনা পাইয়া শল্য আবার যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এইবার যুধিষ্ঠির আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনে তুমুল যুদ্ধ হইল। কেউ কাউকে হারাইতে পারিতেছেন না। এইভাবে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির 'শক্তি' অস্ত্র মারিয়া শল্যকে বধ করিলেন।

শল্য নিহত হইলেন দেখিয়া দুর্যোধন নিজেই এবার সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। ভাঙা রথের স্তূপ আর হতাহত হাতী, ঘোড়া আর মানুষের দেহে যুদ্ধক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইল। এই যুদ্ধে ভীমের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের আরও বারটি ছেলে মারা গেল। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে জীবিত রহিলেন দুর্যোধন। সহদেবের হাতে শকুনি ও তাহার ছেলের মৃত্যু হইল। আর ভীম-অর্জুন বাকী সব শেষ করিলেন। এইরূপে আঠার দিনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইল।





গদা পর্ব

যুদ্ধের পর কৌরব পক্ষে দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা এই চারজন মাত্র বাঁচিয়া রহিলেন। দুর্যোধনের আশা ভরসা সব লোপ পাইল। উদ্‌ভ্রান্তের মত তিনি একটি মাত্র গদা হাতে শিবির ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কুরুক্ষেত্রের কয়েক ক্রোশ দূরে দ্বৈপায়ন হ্রদ। সেই হ্রদের চারি তীর ধরিয়া ঘন নলখাগড়ার বন। দুর্যোধন গিয়া তার মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

পাণ্ডবেরা গুপ্তচর মুখে এই সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। নানারকম কটু কথা বলিয়া দুর্যোধনকে চটাইয়া দিলেন। দুর্যোধন ছিলেন মহা মানী—সামান্য কটু কথাও তিনি সহিতে পারিতেন না। উত্তেজিত দুর্যোধন গদা হাতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এই সময় বলরাম তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিবার পথে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া সকলকে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া যুদ্ধ করিতে বলিলেন। কারণ সেখানে মৃত্যু হইলে স্বর্গবাস হয়।



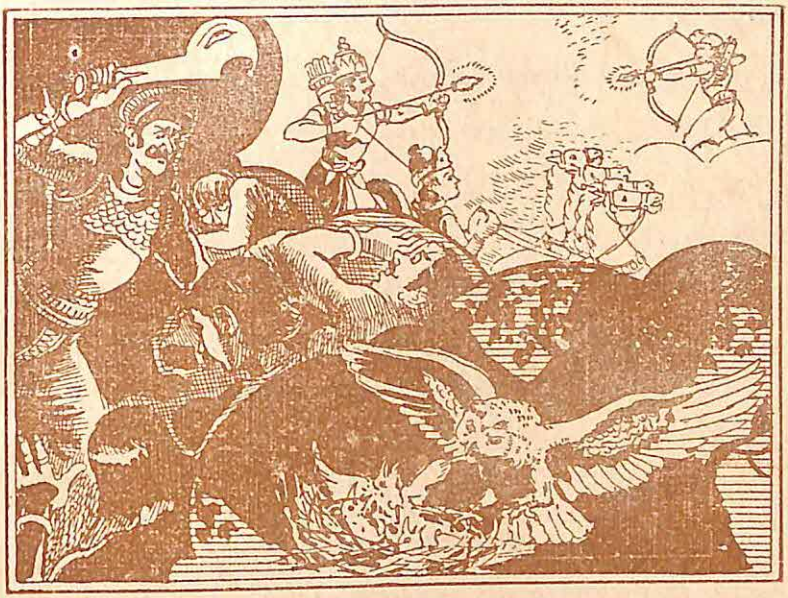
কুরুক্ষেত্রে আসিয়া ভীম আর দুর্যোধনে ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল এই যুদ্ধ। শেষে ভীম গদার আঘাতে দুর্যোধনের দুই ঊরু ভাঙিয়া ফেলিলেন। ভগ্ন-ঊরু কুরুরাজ মাটিতে পড়িয়া হাঁফাইতে লাগিলেন।

দুর্যোধনকে সেইভাবে রাখিয়া পাণ্ডবেরা শিবিরের দিকে চলিলেন। কিন্তু রাত্রিতে তাঁহাদের শিবিরে ফেরা হইল না। শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁহারা নদী তীরেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ইহার কিছুকাল পরে কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা দুর্যোধনের কাছে আসিলেন। ভগ্ন-উরু কুরুরাজ তখন ছট্ফট্ করিতেছেন যন্ত্রণায়। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তিনজন চোখের জলে ভাসিয়া গেলেন। রাগে দুঃখে অস্থির হইয়া অশ্বত্থামা বলিলেন—"যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন আমাকে তুমি অনুমতি দাও কুরুরাজ, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।"

অতি কষ্টে বাহুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া দুর্যোধন উঠিয়া বসিলেন এবং গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন।





সৌপ্তিক পর্ব

সেনাপতি হইয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে লইয়া পাণ্ডব নিধনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। মাত্র তিনজনে পাণ্ডব শিবিরের দিকে যাইতে সাহস করিলেন না। বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া প্রকাণ্ড এক বট গাছের তলায় বসিলেন।

রাত্রি হইলে ক্লান্ত কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা সহজেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অশ্বত্থামা বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। সেই বটগাছে অনেকগুলি পাখির বাসা ছিল; সারাদিন ঘোরাফিরার পর পাখিরা যে যার বাসায় ঘুমাইয়া আছে। এমন সময় একটা পেঁচা আসিয়া সেই গাছে বসিল, এবং একে একে নিদ্রিত পাখিদের হত্যা করিতে লাগিল।

ঘুমে অচেতন পাখিরা কিছুই করিতে পারিল না। একে একে পেঁচার হাতে প্রাণ দিল।

চিন্তাকুল অশ্বত্থামা এ সকলই বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলেন—'তাই তো? এই ভাবেই তো পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করা যায়।' উল্লসিত মনে মাতুল কৃপ ও কৃতবর্মাকে জাগাইয়া তাঁহাদের কাছে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা দুইজনে ছিঃ ছিঃ বলিয়া ধিক্কার দিলেন। নিদ্রিত মানুষকে চোরের মত সংহার করা যে কাপুরুষের কর্ম! কোন বীর পুরুষ কি তাহা করিতে পারেন? কিন্তু অশ্বত্থামার নিতান্ত পীড়াপীড়িতে তাঁহাদের এই অসৎ প্রস্তাবে রাজী হইতে হইল।

তিন জন চুপি চুপি গিয়া দাঁড়াইলেন পাণ্ডব শিবিরের দরজায়। কিন্তু ঢুকিবার উপায় নাই। এক বিশাল পুরুষ শিবির পাহারা দিতেছেন। তাঁর পরণে বাঘ ছাল, হাতে প্রকাণ্ড খড়্গ। অশ্বত্থামা বাণের পর বাণ মারিয়া তাঁহাকে হটাইতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত বাণগুলি গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা বুঝিলেন এই পুরুষ ছদ্মবেশী মহাদেব। তিনি আশুতোষকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলেন। স্তবে তুষ্ট শিব অশ্বত্থামার হাতে খড়্গ দিয়া চলিয়া গেলেন।

তারপর আরম্ভ হইল বিরাট হত্যাকাণ্ড। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দাঁড়াইলেন দরজায়, কেহই যাহাতে পলাইতে না পারে। আর অশ্বত্থামা ভিতরে ঢুকিয়া নির্বিচারে মহাদেবের দেওয়া খড়্গ দিয়া সকলকে হত্যা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার শিবিরে বিষম আর্তনাদ আর হৈ চৈ আরম্ভ হইল কিন্তু কেহই নিস্তার পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে সব শেষ। সকলকে

হত্যা করিয়া অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলের মাথা কাটিয়া লইয়া চলিলেন একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া। তাঁর ধারণা হইয়াছিল এঁরাই যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব। তারপর তিনজনে আবার গেলেন দুর্যোধনের কাছে পাণ্ডব নিধনের সংবাদ দিতে।

সমস্ত শুনিয়া দুর্যোধন প্রথমে খুব খুশী হইলেন। শেষে দ্রৌপদীর ছেলেদের মাথা দেখিয়া তাঁহার মনে বিষম আঘাত লাগিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া—

অনুশোচে দুর্যোধন কান্দে হাহারবে।
বংশনাশ হইল আজি কৌরব পাণ্ডবে॥

"বংশে বাতি দিবার লোকও রাখলে না অশ্বত্থামা"—বলিতে বলিতে দুর্যোধনের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। রক্ত বমি করিতে করিতে কুরুরাজ অসাড় হইয়া পড়িলেন। এইরূপে হর্ষ-বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু হইল।

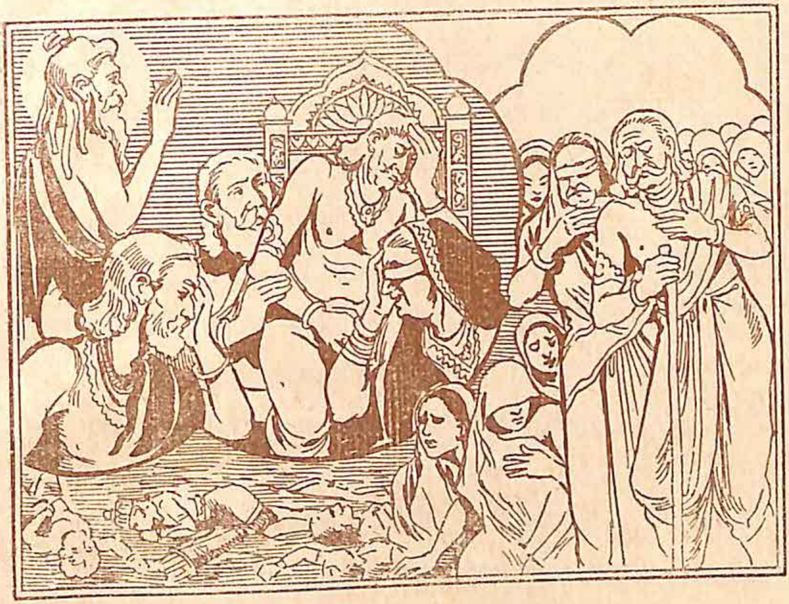
পরদিন সকালে খবর পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে শিবিরে ছুটিয়া আসিলেন। রাত্রের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"যত অনর্থের মূল সেই অশ্বত্থামা। তার মাথা পেলে তবে আমার শান্তি হবে।" কিন্তু অশ্বত্থামা অমর। তাহার মাথা কাটিবে কে? তখন দ্রৌপদী বলিলেন—"তার মাথা যদি না আনা যায় তবে তার মাথায় যে সহজাত মণিটি আছে অন্ততঃ তাই আন।"

অর্জুন তখনি ধনুর্বাণ লইয়া বাহির হইলেন। সঙ্গে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ। বহুদূর গিয়া অশ্বত্থামার সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল। অর্জুনকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া গুরুপুত্র 'পাণ্ডব নিধন হউক' বলিয়া 'ব্রহ্মশির' নামে মহাস্ত্র অর্জুনের প্রতি ছুঁড়িলেন।

অর্জুনও তাহা আটকাইবার জন্য 'দিব্যাস্ত্র' ছুঁড়িলেন। দুই অস্ত্রের তেজে প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইল। বিপদ দেখিয়া দেবতারা উপস্থিত হইলেন দুই অস্ত্রের মাঝখানে, এবং দুই-জনকেই তাঁহাদের অস্ত্র থামাইতে বলিলেন। অর্জুন তখনই তাঁহার অস্ত্র থামাইলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা পারিলেন না। অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরা তখন গর্ভবতী ছিলেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে অর্জুনকে আঘাত করিতে না পারিয়া উত্তরার গর্ভে ঢুকিয়া শিশুটিকে বধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তখনি যোগবলে তাহাকে আবার বাঁচাইয়া দিলেন।

এরই মধ্যে অর্জুন গিয়া ধরিয়াছে অশ্বত্থামার চুলের মুঠি। —"একে গুরুপুত্র তায় আবার অমর—তাই তুমি প্রাণে বেঁচে গেলে। কিন্তু তোমার মাথার মণিটি নিয়ে যাব—কিছুতেই ছাড়ব না।" এই বলিয়া অর্জুন তীক্ষ্ণধার ছুরি বাহির করিলেন। অশ্বত্থামার মাথার চামড়ার সঙ্গে মণিটি আঁটা ছিল। মাংস সুদ্ধ মণিটি অর্জুন ছুরি দিয়া কাটিয়া লইলেন। কাটা স্থান হইতে দর দর ধারে বহিল রক্তের স্রোত। সঙ্গে সঙ্গে বিষম জ্বালা যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অশ্বত্থামা বনে চলিয়া গেলেন। অর্জুন মণি লইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। মণি পাইয়া দ্রৌপদী খানিকটা শান্ত হইলেন।





স্ত্রী পর্ব

আঠার দিনের যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মৃত্যু হইল। হস্তিনার ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠিল। প্রত্যেক বাড়ীরই কেহ না কেহ এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। গান্ধারী পাগলের মত হইয়া গেলেন। মহর্ষি ব্যাস আসিয়া তাঁহাদের বুঝাইয়া কতকটা শান্ত করিলেন।

ব্যাসের কথায় কিছু শান্ত হইয়া অন্ধরাজা সমস্ত মহিলাদের অন্তঃপুর হইতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। তারপর সকলকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। পথে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। গঙ্গাতীর পর্যন্ত তাঁহারা অন্ধরাজার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। তারপর তাঁহার

নিকট চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণ সহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার অবস্থা তখন অতি বীভৎস। চারিদিকে ভাঙা রথ, মৃত ঘোড়া, হাতী আর মানুষের দেহের পাহাড় হইয়া আছে। রক্তস্রোতে যুদ্ধক্ষেত্র কাদা হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার শকুনি, শৃগাল আর কাক মৃতদেহগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে আর ঘন ঘন চীৎকার করিতেছে। এই রকম অবস্থায় কি কেউ স্থির থাকিতে পারে ? কৌরব মহিলারা হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের—

কেহবা পড়িল ভূমে মূর্ছিত হইয়া।
কেহবা কাঁদিতে থাকে বুক চাপড়াইয়া॥

মেয়েদের কান্নার শব্দে যুদ্ধক্ষেত্র ভরিয়া উঠিল। যে যাঁহার আত্মীয় কুটুম্বের মৃত দেহের পাশে পড়িয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন।

অন্ধরাজা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন জানিয়া পাণ্ডবেরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যুযুৎসু ও সাত্যকি। পিতৃব্য ও গান্ধারীকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের মন বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিল। চোখের জলে পা ভাসাইয়া তিনি অন্ধরাজাকে প্রণাম করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ত দেখিতে পান না! জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি প্রণাম করলে বাবা!" ধরা গলায় যুধিষ্ঠির বলিলেন—"আমি যুধিষ্ঠির—জ্যেঠামশাই।" ক্ষুণ্ণমনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি যুধিষ্ঠির—ভীম অর্জুন এরা কোথায়?" তখন অর্জুন, নকুল ও সহদেব আসিয়া একে একে তাঁহাকে

প্রণাম করিলেন। অন্ধরাজা তাঁহাদেরও আলিঙ্গন করিলেন। ভীমও যাইতেছিলেন প্রণাম করিতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া একটি মস্ত বড় লোহার মূর্তি আগাইয়া দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গায়ে ভীষণ জোর ছিল। ভীমই তাঁহাকে নির্বংশ করিয়াছেন। তাই লোহার মূর্তিকে ভীম মনে করিয়া তিনি প্রতিহিংসায় এমন জোরে বুকে চাপিয়া ধরিলেন যে উহা ভাঙিয়া গেল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের বুকে বিষম আঘাত লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের শক্তি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর জ্ঞান লাভ করিলে তিনি ভীমের জন্য কপট শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন—"মহারাজ—আপনি অনর্থক শোক করছেন। ভীম তো মরেন নাই। আপনি তাঁর লৌহ প্রতিমূর্তিটি ভেঙেছেন মাত্র। আপনার পুত্র দুর্যোধন এই মূর্তি তৈরী করে রেখেছিলেন। ভীমের সঙ্গে তো তিনি এমনি পেরে উঠতেন না তাই রোজ এই মূর্তির মাথায় পদাঘাত করে শান্তি পেতেন। ভীমকে বধ করা কি আপনার উচিৎ? আপনার পুত্রেরা কি চিরকাল বেঁচে থাকতেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যুদ্ধ করেই তাঁরা প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেছেন। যে যা করবে তার ফল ভোগও হবে সেই রকম। তাইত আপনার পুত্রদের এমন দশা হল। আপনি জ্ঞানী। অজ্ঞানের মত কাজ করা আপনার মোটেই শোভা পায় না।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র চুপ করিয়া রহিলেন; বুঝিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সহায় তাই পাণ্ডবেরা অবধ্য।

তারপর পাণ্ডবেরা ভয়ে ভয়ে গিয়া গান্ধারীকে প্রণাম

করিলেন। গান্ধারী অসামান্য স্ত্রীলোক। স্বামী অন্ধ, তাই তিনি নিজের চোখ সর্বদা বাঁধিয়া রাখিতেন। জীবনে তিনি কোন অধর্ম করেন নাই। সেজন্য পাণ্ডবেরা তাঁর ভয়ে খুবই ভীত ছিলেন। ক্রোধে গান্ধারী পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ব্যাসদেব তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"তুমি অনর্থক পাণ্ডবদের উপর রাগ করছ। তাঁরা তো কোন কালে কোন অধর্ম করেন নি। মনে নেই কি, যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে—

যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্যোধন।
জিনিবেক কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কোন জন॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম তথা জয় শুন দুর্যোধন॥

তোমার কথাই ফলেছে। ধর্মভীরু পাণ্ডবদের জয় হয়েছে। কাজেই তোমার আর রাগ করা শোভা পায় না।"

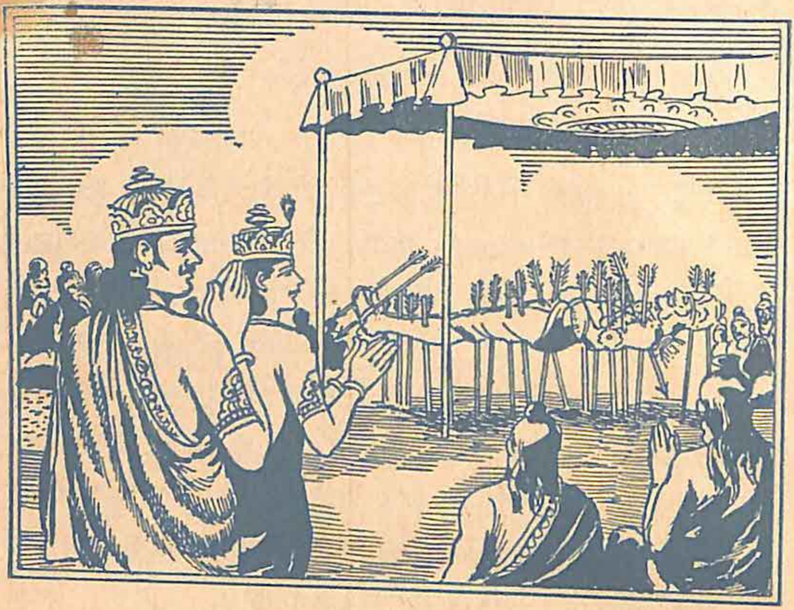
ব্যাসদেবের কথায় গান্ধারী নিরস্ত হইলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা! যত দোষ সব আমার। আমিই তোমার পুত্রদের হত্যাকারী। আমাকে শাপ দিয়ে ভস্ম কর।" গান্ধারী শাপ দিলেন না। কিন্তু চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টি পড়িল তাঁহার পায়ের নখে। সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুড়িয়া কালো হইয়া গেল।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত দেখা করিয়া পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তীর কাছে গেলেন। বহুকাল পরে পুত্রদের দেখিয়া কুন্তী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পুত্রশোকে কাতর দ্রৌপদীও শাশুড়ীর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের

সান্ত্বনা দিয়া গেলেন গান্ধারীর কাছে। গান্ধারী দুর্যোধনের মাথা কোলে লইয়া কাঁদিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় গান্ধারীর ভারী রাগ হইল। তিনি বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ, আমার প্রাণে যে কি জ্বালা তা তুমি কি বুঝবে ? এক নয়, দুই নয়, একশো ছেলে যার মারা গেছে তাকে কি কিছুতে প্রবোধ দেওয়া যায় ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সব নাটের গুরু। তুমি ইচ্ছা না করলে কি এই সর্বনাশা যুদ্ধ হতে পারতো ? না আমার এক শত পুত্রবধূ বিধবা হত ? তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি—

জ্ঞাতিগণ হতে হবে তোমার নিধন।
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে খণ্ডন ॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
এরূপ যন্ত্রণা পাবে, দিনু অভিশাপ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তোমার কথাই সত্য হবে, মা। তবুও তুমি শান্ত হও।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় গান্ধারী শান্ত হইলেন। অন্ধরাজার আদেশে সকলে তখন মৃতগণের সৎকার করিবার আয়োজন করিলেন। নদীতীরে সারি সারি চিতা জ্বলিয়া উঠিল। মৃত বীরগণের স্ত্রীরা যে যাঁহার স্বামীর সহিত সহমরণে গেলেন। কেবল অভিমন্যুর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সহমরণে যাইতে দেওয়া হইল না। সৎকার শেষ হইলে সকলে স্নান ও মৃতের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।



শান্তি পর্ব

মৃত বীরগণের সৎকার করিয়া যুধিষ্ঠির গঙ্গাতীরেই রহিলেন। রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন না। চারিদিকে কেবল কান্নাকাটি ও হাহাকার। মনের দুঃখে যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন তিনি রাজ্য-ভার গ্রহণ করিবেন না। অর্জুনকে সিংহাসন দিয়া আবার বনে চলিয়া যাইবেন। চারিদিক হইতে মুনি ঋষিরা আসিয়া তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির অচল অটল। কোন কথাই তাঁহার মনে ধরিল না।

তখন ভীম ও অর্জুন তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বনে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি জানাইলেন। তবুও যুধিষ্ঠির চুপ। এই খবর পাইয়া ব্যাসদেব পাণ্ডব শিবিরে আসিলেন এবং বলিলেন যে যুদ্ধ জয় করিয়া আবার বনবাসে ফিরিয়া যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। সকলেরই ইচ্ছা এখন যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া

সুখে প্রজাদের পালন করুন। এই অবস্থায় আবার বনবাসে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। নানা রকম গল্পের উদাহরণ সহ উপদেশ ও যুক্তি দিয়া ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন।

যুধিষ্ঠির চুপ করিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না। তখন ব্যাসদেব বলিলেন—"এতেও যদি তোমার মনে শান্তি না আসে তবে ভীষ্মদেবের কাছে যাও। তাঁর মত জ্ঞানী আর হয় না। আমার বিশ্বাস তিনি তোমায় শান্তি দিতে পারবেন।"

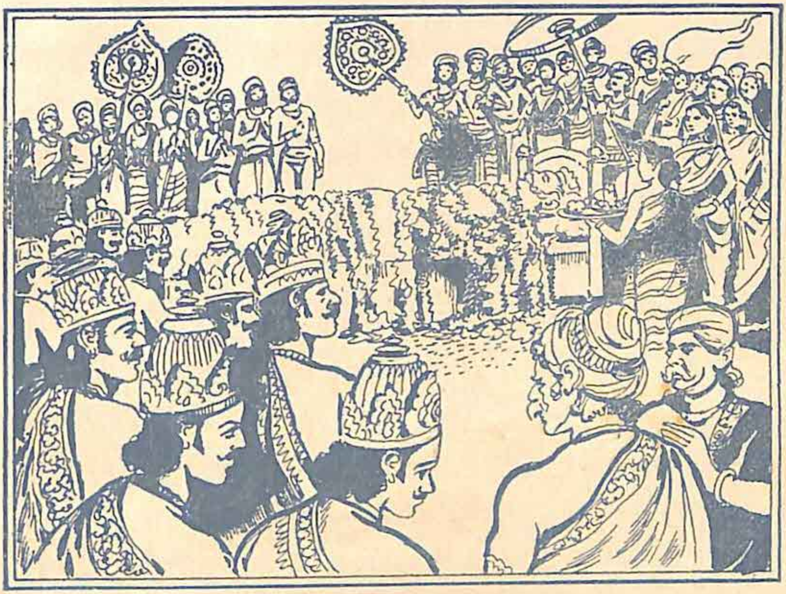
ইহার পরে সকলের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। আনন্দ কোলাহল ও মঙ্গল বাদ্যে রাজপুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

চার্বাক নামে এক রাক্ষস ছিল দুর্যোধনের বন্ধু। বন্ধুর মৃত্যুতে তাহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া সে আসিল প্রতিশোধ লইতে। ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"মহারাজ—আপনি ত' ব্রাহ্মণদের এত দান ধ্যান করেছেন কিন্তু তারা এতে মোটেই খুশী নয়। বরং গুরু ও জ্ঞাতি হত্যাকারী বলে চারিদিকে আপনার বদনাম রটাচ্ছে।"

চার্বাক ভাবিয়াছিল এই কথায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিবাদ বাধিবে এবং পরিণামে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন। কিন্তু উল্টা ফল হইল, ব্রাহ্মণেরা দুষ্টকে চিনিয়া ফেলিলেন এবং হুঙ্কার দিয়া তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণ কর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ভীম হইলেন যুবরাজ। বিদুর

হইলেন মন্ত্রী। সঞ্জয় পাইলেন আয়-ব্যয় ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের ভার। নকুলকে দেওয়া হইল সৈন্য বিভাগের ভার। অর্জুন পাইলেন শত্রুদমন ও শত্রুরাজ্য জয় করার ভার। পুরোহিত ধৌম্য লইলেন দ্বিজ-সেবা ও ধর্মকর্মের ভার। সহদেব শরীর রক্ষী হইয়া সর্বদা রাজার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। এই ভাবে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইয়া শান্তি হইল।





অনুশাসন পর্ব

যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া প্রজাদের পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ অন্ধরাজা ও গান্ধারীকে দেখাশুনার জন্য তিনি যুযুৎসু ও বিদুরকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা পালা করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য কাজ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যুধিষ্ঠির মৃত বীরগণের শ্রাদ্ধকার্য শেষ করিলেন এবং তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখনও হস্তিনায় ছিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না। কাজেই না থাকিয়া উপায় কি? একদিন ভোরবেলা যুধিষ্ঠির গেলেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিতে। গিয়া দেখেন শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানস্থ। একেবারে বাহিরের জ্ঞান নাই। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ধর্মরাজ। কিছুক্ষণ

পরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ভঙ্গ হইল। যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া বলিলেন—"শর-শয্যায় ভীষ্ম আমাকে স্মরণ করছেন তাই সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলাম।" এই কথায় যুধিষ্ঠিরের মনে বড়ই কষ্ট হইল। পিতামহ ভীষ্ম শর-শয্যায় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার একটা সংবাদ নেওয়া হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি তখনই রথ সাজাইতে আদেশ দিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণসহ ভাইদের লইয়া ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কাপড়ের তৈরী শিবিরের মধ্যে মহাপুরুষ শর-শয্যায় শুইয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে বসিয়া আছেন বহু মুনি ঋষি। সকলে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। সমস্ত স্থান জুড়িয়া কেমন যেন একটা নিস্তব্ধ শান্ত ভাব। যুধিষ্ঠিরের মুখ ভার দেখিয়া ভীষ্ম কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"পিতামহ, অজস্র জ্ঞাতিবধ হওয়ায় ধর্মরাজের মনে বড়ই আঘাত লেগেছে। তাঁর ইচ্ছা অর্জুনকে রাজ্য দিয়ে আবার বনে চলে যান। অনেক বুঝিয়েও তাঁকে শান্ত করা যাচ্ছে না। আপনার মত জ্ঞানী পুরুষ তো আর দু'জন নাই। তাই তাঁকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। কিছু উপদেশ দিয়ে ওঁকে শান্ত করুন।"

ভীষ্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"ধর্মরাজ, পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই স্বয়ং ভগবান পাপ দূর করার জন্য এলেন শ্রীকৃষ্ণ রূপে, আর তোমাদের দিয়ে করালেন তাঁর কাজ। কাজেই তোমার এতে দুঃখ করার কি আছে। যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে ও হবে সবই তাঁর ইচ্ছায়। তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র।"

এইভাবে বহু উপদেশ দিয়া ভীষ্ম বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের

ইচ্ছাতেই যুদ্ধে জয় হয়েছে, এখন তাঁর যখন ইচ্ছা তুমি রাজত্ব কর, তখন তোমাকে তাই করতে হবে। যাও, শান্ত মনে সিংহাসনে বসে দান ধ্যান আর যজ্ঞ ইত্যাদি কর তবেই শান্তি পাবে।"

ভীষ্মের কথায় যুধিষ্ঠির কতকটা শান্তি পাইলেন দেখিয়া সকলেই খুব খুশী হইলেন। ভীষ্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"ধর্মরাজ, আমি যতদূর জানি তা তোমাকে বললাম। এখন পুরীতে ফিরে যাও। আমারও দেহত্যাগের সময় কাছে এসে পড়েছে। সামনেই আসছে মাঘ মাস। আমি স্থির করেছি—

সেই মাসে শীতাষ্টমী হয় শুভক্ষণ।
শরীর ত্যজিব আমি ভজি নারায়ণ॥

সেদিন এসে আমাকে দেখে যেও।"

ভীষ্ম নীরব হইলে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে ভীষ্মদেবের দেহত্যাগের দিন ঘনাইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে লইয়া গেলেন তাঁহার কাছে।

সকলকে দেখিয়া ভীষ্ম খুব খুশী হইলেন। যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"ধর্মরাজ, তোমরা সকলে বল আমি দেহত্যাগ করি। যোগী ঋষিরা যুগ যুগ তপস্যা করেও যাঁর দেখা পান না, সেই ভগবান আজ আমার সামনে। এমন সুযোগ কি সকলের ভাগ্যে মিলে! আমার শেষ কথা—তোমাদের বুদ্ধি যেন কখনও সত্যকে পরিত্যাগ না করে। সত্যের সমান বল নাই। তোমাদের মন সর্বদা পবিত্র থাকুক, বুদ্ধি পবিত্র হউক এই কামনা করি।" এই কথা বলিয়া ভীষ্মদেব নীরবে ধ্যানস্থ হইলেন। একে একে

তাঁহার দেহের সমস্ত বাণ খসিয়া পড়িল। আঘাতের কোন চিহ্নমাত্র রহিল না। চারিদিক ঘিরিয়া সমস্ত আত্মীয় কুটুম্ব। সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই অবস্থায় ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আটান্ন দিন পরে ভীষ্মের মৃত্যু হইল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলে মিলিয়া তাঁহার দেহের সৎকার করিয়া রাজপুরীতে ফিরিলেন।





অশ্বমেধ পর্ব

পিতামহ ভীষ্মের কথায় যুধিষ্ঠির রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে আবার মন অস্থির হইয়া উঠিল। এই সময় ব্যাসদেব আসিয়া বলিলেন—"ধর্মরাজ, এত সব দেখে শুনেও যখন তোমার শান্তি হল না তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ কর। এতে তোমার সমস্ত পাপ দূর হবে আর শান্তি পাবে।" কিন্তু এই যজ্ঞ করা তো আর মুখের কথা নয়। বহু ধনরত্নের দরকার ইহাতে। সব ধনরত্ন তো যুদ্ধেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে —এখন উপায় ?

ব্যাসদেব বলিলেন—"ধনরত্নের জন্য ভাবনা কি! আমি তার খোঁজ দিচ্ছি। পুরাকালে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্বতে এক যজ্ঞ করেছিলেন। তাতে তিনি ব্রাহ্মণদের এত সোনা দান করেছিলেন যে ব্রাহ্মণেরা তার সবটা নিয়ে যেতে পারেন

নি। বহু সোনা তাঁরা সেখানেই ফেলে গিয়েছিলেন। সেই সব সোনা এখনও সেখানে পড়ে আছে। তুমি সে সব নিয়ে এসে যজ্ঞ কর।”

তাহাই হইল। হাজার হাজার ঘোড়া, হাতী আর গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া যুধিষ্ঠির হিমালয় হইতে সোনা লইয়া আসিলেন। তারপর যজ্ঞের কাজ আরম্ভ হইল। যজ্ঞের নিয়ম মত একটি ঘোড়ার গলায় জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলেন যুধিষ্ঠির। মহাবীর অর্জুন উহার সঙ্গে চলিলেন রক্ষক হইয়া। সঙ্গে চলিল হাজার হাজার হাতী, ঘোড়া, রথ আর পদাতিক।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আগেই বড় বড় রাজারা সব মারা গিয়াছেন। বাকী ছোটখাট যাঁহারা ছিলেন এইবার আরম্ভ হইল তাঁহাদের উপর আক্রমণ। কেহ বা সহজেই বশ্যতা স্বীকার করিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দেন—কেহ বা ঘোড়া ধরিয়া রাখিয়া যুদ্ধ করেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হয়। এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অশ্বমেধের ঘোড়া গিয়া উপস্থিত হয় মণিপুর রাজ্যে। সেখানকার রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনের পুত্র। তীর্থ যাত্রার সময় অর্জুন মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া সেখানে কিছুদিন ছিলেন। তাঁহাদেরই পুত্র এই বভ্রুবাহন। বভ্রুবাহন ভূমিষ্ঠ হইবার আগেই অর্জুন মণিপুর হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই পিতাপুত্রে পরিচয় নাই। বভ্রুবাহন ঘোড়া দেখিয়াই চটিয়া গেলেন এবং তখনি উহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। রাজ্য জুড়িয়া সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

খবর গেল চিত্রাঙ্গদার কাছে। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—“বাবা তুমি করেছ কি! এ যে তোমার জ্যেঠা-মশাইয়ের ঘোড়া আর রক্ষী হয়ে এসেছেন তোমার বাবা

নিজে। শীঘ্র ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস।" মায়ের আদেশে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইল। বভ্রুবাহন পাত্র মিত্র সহ ঘোড়া লইয়া অর্জুনের সঙ্গে দেখা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া অর্জুন তো রাগিয়া আগুন। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি বলিলেন—

"অভিমন্যু বীর ছিল আমার নন্দন।
সুভদ্রা তনয় বীর বিখ্যাত ভুবন॥
দ্রোণ, দ্রোণী, কৃপ, কর্ণে সংগ্রামে তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া॥

তবুও সে পরাজয় স্বীকার করেনি। আর তুমি আগে ঘোড়া ধরলে শেষে প্রাণের ভয়ে এসেছ আমার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে। আমার পুত্র হলে এরকম করতে না কিছুতেই।"

অর্জুনের গালমন্দ শুনিয়া বভ্রুবাহনের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। মায়ের কথাতেই না তাঁহাকে আজ এই রকম কটু কথা শুনিতে হইল। বিনা যুদ্ধে তিনি কখনই ঘোড়া ছাড়িতেন না। যাক্, অর্জুন যখন তাঁহাকে এই রকম অপমান করিলেন তখন তিনিও সহজে ছাড়িবেন না। দেখা যাউক অর্জুন কি করিয়া ঘোড়া লইয়া যান। এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া বভ্রুবাহন বলিলেন—"মায়ের কথাতেই আজ আমাকে এভাবে অপমানিত হতে হল। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। আমাকে না হারিয়ে আপনি ঘোড়া নিতে পারবেন না।"

বভ্রুবাহনের আদেশে ঘোড়া রাজপুরীতে ফিরাইয়া লইয়া গেল তাঁহার সৈন্যেরা। রাজপুরীতে ফিরিয়া বভ্রুবাহন মাকে সকল কথা সবিস্তারে বলিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিত্রাঙ্গদা

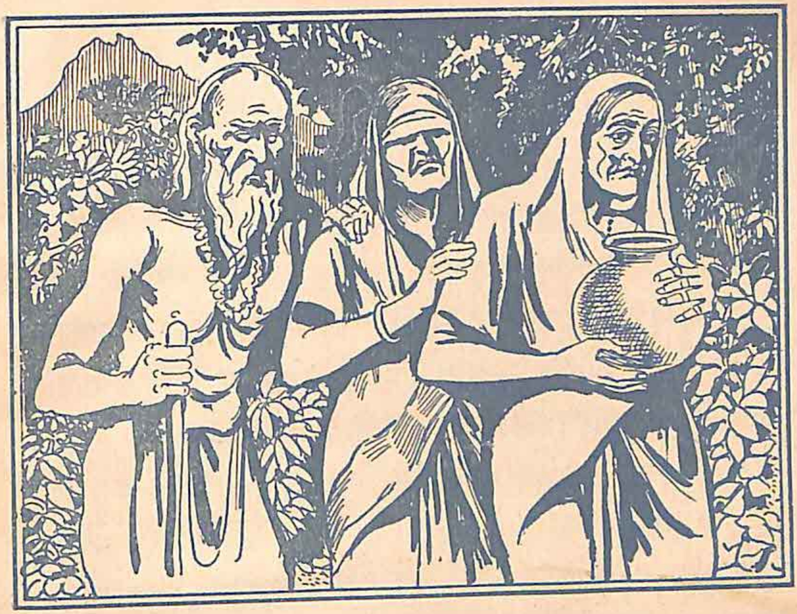
চুপ করিয়া রহিলেন। পিতা পুত্রে আরম্ভ হইল তুমুল যুদ্ধ।

ভীষ্মদেবকে বধ করিবার জন্য গঙ্গাদেবী অর্জুনকে শাপ দিয়াছিলেন যে পুত্রের হাতে তাঁহার পরাজয় হইবে। তাই বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুন পরাজিত হইলেন। পুত্রের বাণে পিতা অজ্ঞান হইয়া রথের উপর পড়িয়া গেলেন। সংবাদ পাইয়া চিত্রাঙ্গদা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের অবস্থা দেখিয়া বভ্রুবাহনেরও চোখে জল আসিল।

এদিকে হইল কি—নাগকন্যা উলুপী এই খবর পাইয়া আসিলেন মণিপুরে। তিনি বলিলেন—"পাতালে অনন্ত নাগের কাছে সঞ্জীবনী মণি আছে। উহা আনিয়া ছোঁয়াইলে অর্জুন সুস্থ হইয়া উঠিবেন।" বভ্রুবাহন নিজে গিয়া সেই মণি লইয়া আসিলেন। মণি ছোঁয়াইতেই অর্জুনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। সস্নেহে বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বীর বটে। এই ত আমার পুত্রের কাজ।"

পিতা পুত্রের মিলন হইল। কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া অর্জুন বিজয়ী ঘোড়া লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। চিত্রাঙ্গদা আর বভ্রুবাহনও গেলেন সেই সঙ্গে যজ্ঞ দেখিতে।

পূর্ণ এক বৎসর পর যজ্ঞের ঘোড়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিল। সেই ঘোড়ার মাংস আহুতি দিয়া যজ্ঞ শেষ হইল। সমবেত মুনি ঋষি আর গরীব দুঃখীরা অজস্র ধনরত্ন পাইয়া বিদায় হইলেন। নিমন্ত্রিত রাজা মহারাজারাও যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। এইরূপে অশ্বমেধ পর্ব শেষ হইল।



আশ্রমবাসিক পর্ব

"অশ্বমেধ যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠিরের মন অনেকটা শান্ত হইল। তিনি সুনিয়মে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর যাহাতে কোন কষ্ট না হয় সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। কুন্তীও সর্বদা তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। এই ভাবে পনের বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু গোলমাল বাঁধিল ভীমকে লইয়া। সকলে অন্ধরাজকে সম্মান ও সেবা করেন বটে কিন্তু ভীম তাঁহাকে কিছুতেই ভাল চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। প্রথম প্রথম অন্ধরাজা তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু শেষে তাঁহারও ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি তখন রাজপুরী ছাড়িয়া বনে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে খুবই কষ্ট হইল। একে বৃদ্ধ, তায় অন্ধ, তার উপর শোকতাপে জর্জরিত। এই

অবস্থায় তাঁহাদের তিনি কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। কিন্তু অন্ধরাজা অটল। সারাজীবন তো দুঃখেই কাটিল, এখন পরকালের কাজ না করিলে চলিবে কেন? তিনি যুধিষ্ঠিরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া রাজী করাইলেন। তারপর যজ্ঞ, দান ও মৃতপুত্রদের শ্রাদ্ধ করিয়া বনবাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কার্তিকী পূর্ণিমা। সকলের নিকট বিদায় লইয়া বিদুর, সঞ্জয় ও গান্ধারীসহ অন্ধরাজা শুভদিনে বনবাস যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবেরা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাদের কতকটা পথ আগাইয়া দিয়া আসিলেন। সকলে পুরী হইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময় কুন্তী আসিয়া অন্ধরাজার সঙ্গে যোগ দিলেন। ইহা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেলেন। অন্ধরাজার বনে যাওয়ার একটা অর্থ আছে কিন্তু ইনি তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন কেন? পুত্র ও বধূরা ঘিরিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সকলেরই মুখে এক কথা। "আপনি কেন বনে গিয়ে কষ্ট ভোগ করবেন। সারাজীবন তো কষ্টেই গেল। এখন কিছুটা দিন অন্তত শান্তি ভোগ করুন।"

কুন্তী কোন কথা শুনিলেন না। সকলের কাছে বিদায় লইয়া তিনি তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।

অন্ধরাজা সকলকে লইয়া প্রথম রাত্রি গঙ্গাতীরে কাটাইলেন। পরদিন সকালে যাত্রা করিলেন উত্তর দিকে। চলিতে চলিতে তাঁহারা বহু বন জঙ্গল পার হইয়া দ্বৈপায়ন বনে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সকলের মনে খুব আনন্দ হইল। স্থির হইল তথায় থাকিয়া সাধনা করিতে হইবে। অন্ধরাজার কথায় বিদুর আর সঞ্জয় মিলিয়া—

দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে॥

একখানি কুটীরে রহিলেন গান্ধারী আর কুন্তী। অপরখানিতে অন্ধরাজা বিদুর ও সঞ্জয়কে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভোরে উঠিয়া স্নান করেন—তারপর সারাদিন কাটে ধ্যান আর জপে। দিনের শেষে বিদুর আর সঞ্জয় গিয়া ফলফুল সংগ্রহ করিয়া আনেন। আর তাহাতেই সকলের ক্ষুধা দূর হয়। রাত্রি হইলে বনবাসী মুনি ঋষিরা আসেন আশ্রমে। বহুক্ষণ ধরিয়া সৎ আলোচনা চলে। তাঁহারা চলিয়া গেলে সকলে ঘুমাইয়া পড়েন। এইভাবে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

এদিকে পাণ্ডবেরা কিছুদিন পর ধৃতরাষ্ট্রের খোঁজ খবর লইবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে অন্ধরাজা খুব খুশী হইলেন। যুধিষ্ঠির একে একে সকলের খবর লইতেছিলেন। বিদুরের খবর লইয়া জানিলেন যে আজকাল তাঁহার অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কখন আসেন, কখন যান তার কোনও ঠিক নাই। মাথায় মস্ত জটা, কেমন যেন উন্মনা ভাব। খাওয়া দাওয়ার দিকেও নজর নাই। ধৃতরাষ্ট্র ধীরে ধীরে এই কথা বলিতেছিলেন এই সময় হঠাৎ বিদুর আসিলেন সেখানে। তারপর পাণ্ডবদের দেখিয়াই আবার ফিরিয়া চলিলেন বনের দিকে। যুধিষ্ঠিরও চলিলেন তাঁহার পিছনে। খানিকদূর গিয়া বিদুর একটি গাছে হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

বিদুরের দেহত্যাগে পাণ্ডবদের মনে বড়ই কষ্ট হইল।

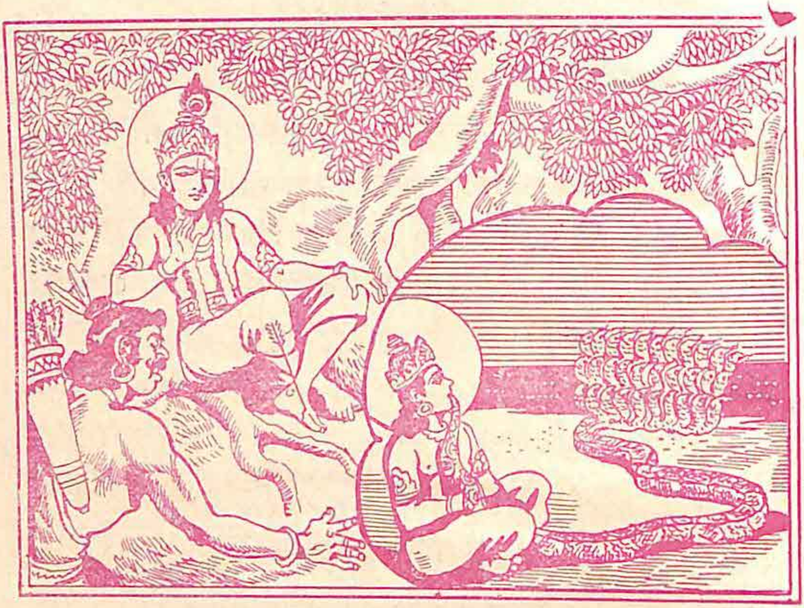
চরম দুঃখের সময় ইনিই ছিলেন তাঁহাদের প্রকৃত বন্ধু। আর আজ একটু সুখের মুখ দেখিতে না দেখিতেই তিনি তাঁহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বিদুরের জন্য সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই সময় ব্যাসদেব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপদেশে সকলে শান্ত হইলেন। পাণ্ডবেরা সেখানে প্রায় এক মাস রহিলেন। পরম যত্নে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মাতা কুন্তীর সেবা করিলেন। একমাস পরে অন্ধরাজা তাঁহাদের রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কারণ রাজা-হীন রাজ্যে নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয় ও রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

অন্ধরাজার কথায় পাণ্ডবেরা রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। যুধিষ্ঠির অন্ধরাজার খবর লইয়া জানিলেন যে তাঁহারা আর আশ্রমে নাই। কোথায় গিয়াছেন কেউ বলিতে পারে না। ভারী চিন্তায় পড়িলেন ধর্মরাজ। তাঁহার আদেশে চারিদিকে লোক গেল অন্ধরাজার খবর আনিতে। এই সময় একদিন নারদ ঋষি আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার কাছে যুধিষ্ঠির অন্ধরাজার সমস্ত খবর পাইলেন। নারদ বলিলেন—"ধর্মরাজ, তোমরা রাজধানীতে ফিরে আসার পর অন্ধরাজা সকলকে নিয়ে গেলেন গঙ্গাদ্বারে। সেখানে চললো কঠোর তপস্যা। কোন-দিন কিছু খাওয়া হয়, কোনদিন তাও হয় না। এইভাবে তাঁদের দিন কাটছিল। একদিন সকলে গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন বনের ভিতর দিয়ে—হঠাৎ চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠল। বিষম দাবানল। কঠোর তপস্যায় তাঁদের শরীর দুর্বল হয়ে ছিল। কেউ পালাতে পারলেন না। সেই আগুনে

পুড়ে তাঁরা স্বর্গে চলে গেছেন।"

নারদের কথায় রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। যুধিষ্ঠির মাটিতে পড়িয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। নারদ তখন তাঁহাদের নানা উপদেশ দিয়া শান্ত করিলেন। যথারীতি অন্ধরাজা, গান্ধারী, মাতা কুন্তী ও সঞ্জয়ের শ্রাদ্ধাদি করিলেন পাণ্ডবেরা। নারদ সকলকে শান্ত থাকিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।





মুষল পর্ব

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও দলবল সহ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। চারিদিকে তাঁহার পূজা চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া যাদবদের অহঙ্কার আর ধরে না। এখন ত তাঁহারাই সবার উপরে—তবে আর ভাবনা কি? কথায় কথায় তাঁহারা যাকে তাকে অপমান করিয়া বসেন। লঘু গুরু জ্ঞান নাই একেবারে। এই সময় একদিন নারদ, কণ্ব ও বিশ্বামিত্র ঋষি দ্বারকায় আসিলেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য।

ঋষিদের দেখিয়া যদু বালকগণ বলাবলি করিতে লাগিল—"ওরে, এই ঋষিরা নাকি মহা শক্তিমান। ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। আয়, এদের নিয়ে একটু মজা করা যাক।" তাহাদের মধ্যে শাম্ব ছিল অপরূপ রূপবান। সকলে মিলিয়া

করিল কি শাম্বকে মেয়ে সাজাইয়া লইয়া গেল ঋষিদের কাছে। তারপর বলিল—"আচ্ছা মুনি ঠাকুর, আপনারা ত সবই বলতে পারেন। বলুন ত এই মেয়েটির কি সন্তান হবে—ছেলে না মেয়ে?"

বালকদের কথায় ঋষিরা ভারী বিরক্ত হইলেন। যদু বংশের ছেলে বলিয়া একেবারে মাথায় উঠিয়াছে! লঘু গুরু জ্ঞান নাই। ক্রুদ্ধ ঋষিরা অভিশাপ দিলেন—"এ একটি মুষল প্রসব করবে আর সেই মুষলই করবে তোমাদের বংশ নাশ।" পরদিন শাম্বের পেট হইতে একটি লোহার মুষল বাহির হইল। শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের অভিশাপের কথা শুনিয়া মুষলটি গুঁড়া করিয়া প্রভাসের জলে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে সেখানে হইয়া উঠিল মস্ত বড় নলখাগড়ার বন।

ক্রমে যাদবেরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। দিন রাত হৈ হল্লা আর মদের নেশায় ডুবিয়া থাকিত। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের তৃপ্তি নাই। সকলে মিলিয়া স্থির করিল দ্বারকার বাহিরে কোথাও গিয়া আনন্দ করিতে হইবে। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমার মতে প্রভাস তীর্থই এর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাজ নেই, তাঁরা ঘরেই থাকুন। কেবল মাত্র পুরুষেরাই চল, সেখানে বেশ আমোদ হবে।" তাহাই হইল। রাজপুরীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। দলে দলে যাদবেরা সাজসজ্জা করিয়া পুরী হইতে বাহির হইল। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিলেন। মেয়েরা দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিলেন। আজ আর তাঁহাদের কিছুই ভাল লাগিতেছে না। চারিদিকে কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিতেছে মনে হইল। এইভাবে—

দ্বারকা ছাড়িয়া হইল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আঁধার হইল দ্বারকা ভুবন ॥

চোখের জল ফেলিয়া যাদব মহিলারা ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রভাস তীর্থে পৌঁছিয়া সকলে প্রথমে খুব একচোট খেলা-ধুলা করিল। তারপর জলে নামিয়া হুটোপাটি আর সাঁতার-কাটা চলিল। সাঁতার ও স্নান শেষ করিয়া সকলে উপরে উঠিয়া আসিল। গা হাত পা মুছিয়া শুকনা কাপড় পরিয়া খাইতে বসিয়া গেল। খাবারের সঙ্গে আরম্ভ হইল মদ্যপান। মদ খাইয়া যাদবেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিল। অমনি আরম্ভ হইল কথা কাটাকাটি। কথা কাটাকাটি হইতে হইতে তুমুল ঝগড়া। তারপর আরম্ভ হইল যুদ্ধ। সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুবীরগণ মাতাল হইয়া একে অন্যকে বধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল। অস্ত্রশস্ত্র যাহা সঙ্গে ছিল—সব শেষ হইয়া গেল কিন্তু যুদ্ধ থামিল না। কাছেই ছিল সেই নলখাগড়ার বন। মুষলের গুঁড়া হইতে এই বনের জন্ম। উন্মত্ত যাদবেরা সেই বন হইতে নলখাগড়া তুলিয়া আনিয়া মারিতে লাগিল একে অন্যের মাথায়। আশ্চর্যের কথা, এই খাগড়ার আঘাত যাহার গায়ে লাগিল তাহারই মৃত্যু হইল।

এইরূপে যদুকুল নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সারথি দারুককে তখনি অর্জুনের কাছে পাঠাইলেন। আর বলিয়া দিলেন—অর্জুন যেন একটুও বিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসেন।

দারুক চলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বভ্রুকে লইয়া গেলেন বলরামের খোঁজে। বলরাম তখন একটি গাছের নীচে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"দাদা,

মেয়েদের রক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্য আমি দ্বারকায় যাচ্ছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। বসুদেবকে যদু বংশ ধ্বংসের কথা জানাইয়া বলিলেন—"পিতা, আমি অর্জুনকে আসার জন্য খবর পাঠিয়েছি। তিনি না আসা পর্যন্ত আপনি মেয়েদের দেখাশুনা করবেন। আর আমাদের দেখা হবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বলরামের কাছে গেলেন। বলরামের তখন সমাধি অবস্থা। বাহিরের কোন জ্ঞান নাই। তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সাদা সাপ বাহির হইয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। সেই সাপের হাজার ফণা। সেই সব ফণার উপর জ্বলিতেছে হাজার মণি। সমুদ্রদেব বরুণ আর নাগগণ চলিয়াছেন তাহার সঙ্গে নানা রকম বাদ্য বাজাইয়া। দেখিতে দেখিতে সেই মহানাগ মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িল। বলরামের অসাড় দেহ পড়িয়া রহিল সেখানে।

বলরামের দেহত্যাগের পর শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িলেন এক গাছের নীচে এবং সমাধিস্থ অবস্থায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। এই সময় জরা নামক এক ব্যাধ হরিণ মনে করিয়া দূর হইতে তাঁহার উপর বাণ মারিল। সেই বাণ আসিয়া বিঁধিল শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলায়। হরিণ পড়িয়াছে মনে করিয়া ব্যাধ ছুটিয়া আসিল সেখানে। কিন্তু একি সর্বনাশ! এ তো হরিণ নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে! তখন—

ভয়ার্ত হইয়া ব্যাধ মাগে নিজ অপরাধ
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতার অনাদি পুরুষ আর
তুমি সার এ তিন ভুবনে॥

"প্রভু, না জেনে এই সর্বনাশ করেছি, এখন আমার উপায় কি হবে ?" মাটিতে পড়িয়া ব্যাধ অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"এতে তোমার কোন অপরাধ নেই। দুঃখ কোর না।" এই বলিয়া কৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার অমর আত্মা বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।

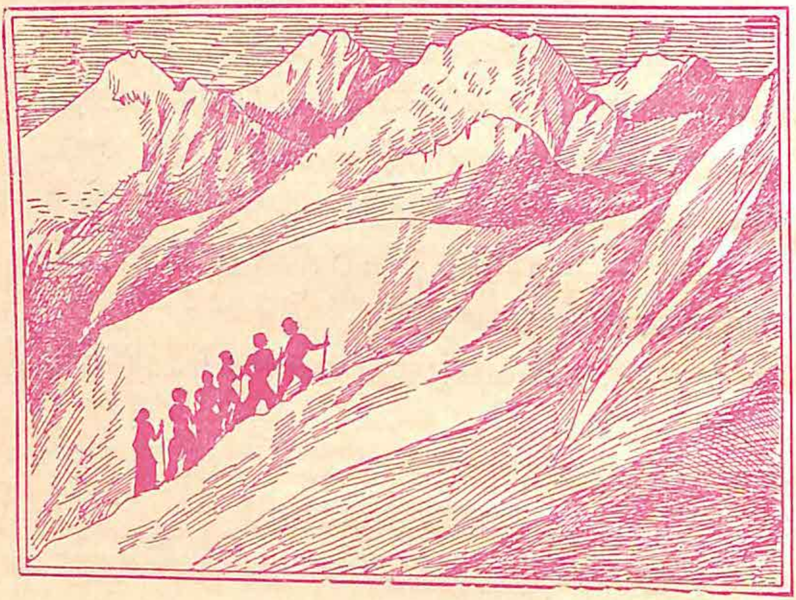
এদিকে দারুক হস্তিনায় গিয়া, অর্জুনকে দ্বারকায় লইয়া আসিল। অর্জুন আসিয়া দেখিলেন দ্বারকাপুরী শ্মশান হইয়া গিয়াছে। বসুদেব তখনও জীবিত ছিলেন। পরদিন তিনিও মারা গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অর্জুনের বুক ভাঙিয়া গেল। কিন্তু এখন তো দুঃখ করিবার সময় নাই। কাজেই মনের দুঃখ মনে চাপিয়া অর্জুন প্রথমে বাসুদেব প্রভৃতি যাদব-গণের সৎকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাতি ব্রজকে মথুরায় রাখিয়া আসিলেন। তারপর সমস্ত যাদব মহিলাকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁহারা দ্বারকাপুরী ছাড়িয়া আসিতেই তাহা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল!

নীরবে দাঁড়াইয়া অর্জুন দেখিলেন দ্বারকার পরিণাম। তারপর সকলকে লইয়া অগ্রসর হইলেন হস্তিনার পথে। অর্ধেক পথ পার হইতে না হইতে হঠাৎ এক বিরাট দস্যুদল আসিয়া তাঁহাদের আক্রমণ করিল। ক্রোধে অস্থির হইয়া অর্জুন গাণ্ডীব ধনুকে হাত দিলেন। কিন্তু তুলিতে গিয়া দেখিলেন দেহে বল নাই। বহু কষ্টে ধনুকখানি তুলিয়া যদি বা গুণ পরাইলেন কিন্তু বাণ আর ছুঁড়িতে পারিলেন না। চোখের সামনে দুষ্ট দস্যুরা যাদব মহিলাদের হরণ করিয়া লইয়া গেল। অর্জুন অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া দেখিলেন। কিছুই করিতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল।

ক্ষুণ্ণমনে তিনি ব্যাসদেবকে গিয়া জানাইলেন সমস্ত কথা। ব্যাসদেব বলিলেন—“তুমি যা বললে এতে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর এখানে থাকা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তোমাদের বল, ভরসা—সব কিছু। তিনি যখন নাই তখন আর তোমাদের এখানে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করার কোন অর্থ হয় না।”

ব্যাসদেবের কথা শুনিয়া অর্জুন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন।





স্বর্গারোহণ পর্ব

অর্জুনের কাছে সমস্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠির সংসার ছাড়িয়া যাইতে মন স্থির করিলেন। পাণ্ডবদের বল, বুদ্ধি, ভরসা শ্রীকৃষ্ণ যখন চলিয়া গিয়াছেন তখন আর কাহার ভরসায় সংসারে থাকা যায়? এই স্থির করিয়া ধর্মরাজ ভাইদের বলিলেন—"ভাই, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এ সংসারে আর আমার মুহূর্তও থাকার ইচ্ছা নাই। আমি ঠিক করেছি যত শীঘ্র পারি হিমালয়ে চলে যাব। আর ঘরে ফিরব না। তোমাদের কি মত বল।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া চার ভাই একবাক্যে বলিলেন—"দাদা, আপনি চলে গেলে আমরা আর কাকে নিয়ে থাকব? আপনার সঙ্গেই আমরা হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করব।" পাণ্ডবদের কথায় দ্রৌপদীও তাঁহাদের সঙ্গী হইবেন স্থির করিলেন।

তাহাই হইল। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে রাজা করিয়া তাঁহারা মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তারপর আত্মীয় বন্ধুদের কাছে বিদায় লইয়া শুভক্ষণে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ বাহির হইলেন রাজধানী হইতে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে খবর ছড়াইয়া পড়িল। পাণ্ডবেরা চিরকালের জন্য চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া প্রজাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা ছুটিয়া আসিল। বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল চারিদিকে। মরিবে কি বাঁচিবে সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই।—

আপনা পাসরে লোক উভরড়ে ধায়।
দৌড়াদৌড়ি উভরড় পথ নাহি পায়॥
রমণী পুরুষ সব ধায় রড়ারড়ি।
চতুর্দিকে কান্দে সবে পাণ্ডবেরে বেড়ি॥

"আমাদের ছেড়ে যেও না ধর্মরাজ, দোহাই তোমার।" মাটিতে পড়িয়া তাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডবেরা কিছুতেই থাকিতে রাজী হইলেন না। নানাভাবে প্রজাদের প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেলেন মহাপ্রস্থানের পথে। ঐ সময় একটি কুকুরও চলিল তাঁহাদের সঙ্গে। প্রজারা বহুদূর পর্যন্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে গিয়া তারপর ফিরিয়া গেল যার যার ঘরে, কিন্তু কুকুরটি আর ফিরিল না।

পাণ্ডবেরা ক্রমে পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। বহু পাহাড়, পর্বত ও নদী পার হইয়া লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। এ পর্যন্ত গাণ্ডীব ধনুক অক্ষয় তূণ অর্জুনের সঙ্গেই ছিল। অগ্নির কথায় তিনি সেই ধনুক ও তূণ সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলেন। সেখান হইতে পাণ্ডবেরা দক্ষিণদিকে

চলিলেন এবং সমুদ্রের তীর ধরিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। সম্পূর্ণ দ্বারকা তখন জলের নীচে। কেবল দুই একটি মন্দিরের চূড়া জলের উপর মাথা জাগাইয়া আছে মাত্র। দ্বারকা ছাড়াইয়া তাঁহারা চলিলেন উত্তর দিকে। চলিতে চলিতে উপস্থিত হইলেন হিমালয়ের নীচে।

তারপর আরম্ভ হইল পর্বতারোহণ। বিশাল হিমালয় পর্বত ধাপে ধাপে উঠিয়াছে উঁচু হইয়া। বন জঙ্গল পরিপূর্ণ পর্বত পার হইয়া পাণ্ডবেরা আসিলেন বরফ ঢাকা পর্বতের সামনে। ঐ কঠিন পর্বতের উপর দিয়া উপরে উঠিতে হইবে। ধীরে ধীরে তাঁহারা উঠিতে লাগিলেন। প্রথমে যুধিষ্ঠির, পরে যথাক্রমে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। সকলের পিছনে চলিলেন দ্রৌপদী। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বরফ আর বরফ। গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই। যেমন হাওয়া তেমনি শীত। কনকনে শীতে একপা চলে কার সাধ্য। শরীরের রক্ত যেন জমিয়া যাইতেছে।

পাহাড়ের পর পাহাড় পার হইয়া অতিকষ্টে পাণ্ডবেরা চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ দ্রৌপদী পড়িয়া গেলেন বরফের উপর। আর উঠিলেন না। দারুণ ঠাণ্ডায় তাঁহার হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর একে একে সহদেব, নকুল, অর্জুন এবং ভীমেরও ঐ একই দশা হইল। এত বড় বড় যোদ্ধাও হিমালয়ের হিম সহ্য করিতে পারিলেন না।

যুধিষ্ঠির কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। এক মনে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। কুকুর কিন্তু সঙ্গেই আছে। এই সময় দেবরাজ

ইন্দ্র রথে চড়িয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইলেন। উজ্জ্বল রথ দেখিয়া যুধিষ্ঠির সেখানে দাঁড়াইলেন। ইন্দ্র তখন তাঁহাকে বলিলেন—"যুধিষ্ঠির, তোমার স্ত্রী ও ভাইয়েরা আগেই দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেছেন। একমাত্র তুমিই সশরীরে স্বর্গে যাবার অধিকারী। তাই আমি নিজেই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য রথ নিয়ে এসেছি।"



যুধিষ্ঠির তখন কুকুরটিকে লইয়া রথে উঠিতে গেলেন। ইন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন—"ও কি! আবার ওটাকে নিচ্ছ কোথায়? কুকুর নিয়ে কি স্বর্গে যাওয়া যায়! পথের কুকুর পথেই পড়ে থাক।"

থমকিয়া দাঁড়াইলেন যুধিষ্ঠির। ইন্দ্রকে বলিলেন—"নিজের স্ত্রী এবং সহোদর ভায়েরা পর্যন্ত আমায় ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু এ বেচারী কিছুতেই আমাকে ছেড়ে যায় নি। আমিও তাকে ছাড়তে পারি না। আপনি রথ নিয়ে চলে

যান দেবরাজ, একে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।”

হঠাৎ চারিদিক আলোয় আলো হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কুকুর আর নাই। তাহার স্থানে দাঁড়াইয়া স্বয়ং ধর্মরাজ। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করার জন্য কুকুররূপে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মৃদু হাসিয়া ধর্মরাজ বলিলেন, “মহারাজ, তোমায় পরীক্ষা করলাম মাত্র। দেখলাম তোমার মত ধার্মিক এ সংসারে আর কেহই নাই। তুমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পার।” এই বলিয়া ধর্মরাজ অদৃশ্য হইলেন। দেবতারা যুধিষ্ঠিরকে লইয়া স্বর্গে গেলেন।

“মহাভারতের কথা অমৃত সমান।”



Chakraborty : CHHOTODER MAHABHARAT
ISBN 0 00121 026 2

Rs. 10·50